ওরা তিনজন

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

প্রকাশক :

প্রবীর কুমার ভট্টাচার্য

বুক্‌স অনলি

৫৪/৮ কলেজ স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ

১লা মাঘ, ১৩৬৭

জানুয়ারী ১৯৬০

মুদ্রাকর :

গোপাল চন্দ্র রায়

লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস

৬, শিবু বিশ্বাস লেন

কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

স্নেহের

শ্রীমান আশীষ্ সেন

শ্রীমান অভিজিৎ সেন

স্নেহাস্পদেষু—

আশীর্বাদক

——মামা

গড়িয়াহাট রোড
কলিকাতা-২৯

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ—

অস্থি ভাগিরথী তীরে

ময়ুর মহল (নাটক)

উত্তর ফাল্গুনী

মৃত্যু বান

কিরীটী অমনিবাস (১ম-হইতে ৯ম-খণ্ড)

পলি মাটি

কালো ভ্রমর প্রভৃতি

॥ এক ॥

প্রমীলা নাকি আত্মহত্যা করেছে। প্রমীলা আত্মহত্যা করেছে কথাটা শিবেনের যেমন অসম্ভব তেমনি যেন অবিশ্বাস্য মনে হয়। এই তো মাত্র গত পরশুই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে দেখা হয়েছিল প্রমীলার সঙ্গে শিবেনের।

সেই হাসিখুশি কৌতুকপ্রবণ প্রাণোচ্ছল প্রমীলা। কই, সেদিনও তো দু'ঘণ্টার মধ্যে প্রায় একবারও শিবেনের মনে হয়নি ওর মধ্যে কোথাও কোনপ্রকারে দুশ্চিন্তা বা দুর্ভাবনা আছে। ওর চিরদিন যেমন বন্ধুবান্ধবদের 'লেগ-পুল' করা অভ্যাস, বিশেষ নির্মলের সঙ্গে, সেদিনও সন্ধ্যায় প্রমীলা 'লেগ-পুল' করছিল।

নির্মল যত গম্ভীর হয়ে ওঠে, প্রমীলা যেন ততই ওকে বেশী জ্বালাতন করছিল—আর নির্মলের বিরক্তিতে ওর চাপা হাসি আরও বেশী প্রকট হয়ে উঠছিল।

অবশেষে একসময় হঠাৎ উঠে পড়ে বলেছিল, আমি চললাম শিবেন।

প্রমীলা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিল, 'সে কি! এরই মধ্যে চললে মানে? না না তা হয় নাকি! এখনও তো সন্ধ্যাই উৎরাল না। বস বস, আর এক কাপ কফি হোক and I shall stand, তারপর একবাসেই ফেরা যাবে—চাই কি ট্যাক্সিও নিতে পারি।

না, ধন্যবাদ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নির্মল বললে।

প্রমীলা চাপা হাসি হাসতে হাসতেই বলে ওঠে, আবার ধন্যবাদের

কি আছে—**after all we are all friends here! Have another cap of coffee**—বস বস—

না।

প্রমীলাই তখন বলে উঠেছিল, শিবেন, নির্মল নিশ্চয়ই রাগ করেছে। বলেই আবার সে তার স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকপ্রিয়তায় ফিরে আসে, তা সে তুমি যাই বল নির্মল, ঐ গোলকুমড়োর মত দেখতে মীনাক্ষীর পাশে তোমাকে justlike a perpendicul r—মনের পাতায় যখনই ছবিটা ভেসে ওঠে—আর বলতে পারেনি প্রমীলা, মুখে হাত চাপা দিয়ে উচ্ছ্বসিত হাসিতে যেন একেবারে ভেঙে পড়েছিল।

প্রমীলা মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসিটা রোধ করবার চেষ্টা করছে। একটু ঝুঁকিয়ে রেখে দু'পাশ দিয়ে নেমে আসা লম্বা বিনুনী দুলছে থেকে থেকে। আর নির্মল স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে দিকে।

লা আবার বলে ওঠে, তার চাইতে একটা ডানলোপিলো-

মৃদু চাপা গলায় বলে ওঠে, Vulg r!

লা মুখ তুলে তাকায় নির্মলের দিকে। উচ্ছ্বসিত হাসির বেগটা রোধ করতে করতে বলে, ভালগার—ভালগারের কি আছে! তুমি একটা ডানলোপিলোর সঙ্গে গদগদ হয়ে প্রেম করতে পার—আর তুমি তো তন্বী শ্যামা শিখরদশনা—মীনাক্ষী না হয় ডানলোপিলোই হল, তা ছাড়া—

সবাই তো সমান হয় না! অত অহঙ্কার ভাল নয় প্রমীলা দেবী—চাপা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে ওঠে নির্মল।

এতক্ষন শিবেন একটা কথাও বলেনি, বরং ব্যাপারটা সত্যি বলতে কি উপভোগই করছিল। কিন্তু ক্রমশঃ ব্যাপারটা যেন কেমন বাঁকা পথ ধরছে তার মনে হতেই সে প্রমীলাকেই বলে ওঠে, আঃ প্রমীলা, থাম তো—এই নির্মল বোস—বোস—

টা বলে নির্মল আর দাঁড়ায়নি। বেশ একটু দ্রুতপদেই
কে অতঃপর বের হয়ে গিয়েছিল।

ন তখন বলেছিল, সত্যিই নির্মল রেগে গিয়েছে প্রমীলা।

সত্যিই বোধ হয় জোকিং মুডে ছিল না।

লা তখনও হাসছে।

সত্যিই কি ব্যাপার বল তো প্রমীলা? শিবেন শুধায়!

ার কি ব্যাপার?

মানাক্ষী সম্পর্কে যা একটু আগে বলছিলে। সত্যি নাকি
রটা?

জানি না, তবে একটু যেন বেশীই ওরা আজকাল মাখামাখি
করছে—

প্রেম!

নির্মল করবে প্রেম—তবেই হয়েছে—

কেন? হঠাৎ ও কথা কেন?

তোমরা নির্মলকে কতটা জান জানি না শিবেন। আমার
বেশী, ওকে আমি খুব ভাল করেই চিনি। কিন্তু আর না শিবেন।
া যাক—

মীলা যেন প্রসঙ্গটার উপর অকস্মাৎ একটা দাঁড়ি টেনে দিয়ে
পড়েছিল। দু'জনে কফি হাউস থেকে বের হয়ে বাস স্ট্যাণ্ডের
বেশ কিছুক্ষণ বাসের অপেক্ষায় পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল—
যদিও যাবে উল্টো দিকে।

ন্তু একটা কথাও আর অতঃপর হয়নি ওদের পরস্পরের মধ্যে
প্রায় আধ ঘণ্টা ওরা পাশাপাশি বাস-স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়েছিল।
মীলাকে কেমন যেন একটু অন্যমনস্কই ওর মনে হয়েছিল
কথাটা মনে পড়ছে শিবেনের।

তবু—

তবু মনে হয় শিবেনের, সমস্ত ব্যাপারটাই আগাগোড়া ঠা... রসিকতা নয় তো? সত্যি সত্যি একটু আগে নির্মল ফোনে... সঙ্গে ঠাট্টা বা রসিকতা করল না তো?

কিন্তু আবার মনে হয় অমন একটা ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা-রসি... তা ছাড়া নির্মলের অমন প্রকৃতিই তো নয়, বরাবরই একটু সি... টাইপের ছেলে!

কিন্তু সত্যি-সত্যি নির্মলেরই ফোন তো?

হ্যাঁ, নির্মলই; নির্মলই তাকে ফোন করেছিল—যদিও নির্মল নাম বলেনি; সে তো নাম জিজ্ঞাসা করেনি এবং সত্য কথা ... কি, কে ফোন করছে তাকে ঐ মুহূর্তে কথাটা তলিয়ে ভাববার মতও বুঝি তার মনের অবস্থা ছিল না।

তা না হোক, গলার স্বরটা নির্মলেরই।

নির্মলদের বাড়িতে ফোন আছে। আগেও অনেকবার নির্মল তাকে ফোন করেছে। নির্মলের ফোনের গলা তার চেনা।... হবার ... ওঠে না।

না, নির্মল ছাড়া আর কেউ না—অন্য কেউ হতেই পারে ন

ফোনের শব্দে ঘুমটা ভেঙে যেতেই হাত বাড়িয়ে ... রিসিভারটা তুলেনিয়েছিল শিবেন।

হ্যালো!

অন্য প্রান্ত থেকে প্রশ্ন, শিবেন?

হ্যাঁ, কে?

তারপরই আবার নির্মলের গলা, শুনেছিস প্রমীলা সুইসাইড করেছে!

কে—কে সুইসাইড করেছে?

প্রমীলা। প্রমীলা চক্রবর্তী।

টা প্রচণ্ড শব্দের মত যেন 'প্রমীলা' নামটা তার কর্ণপটাহে হুড়ে পড়েছিল।

কটা বোবা বিহ্বল মুহূর্ত। হাতের মধ্যে ফোনের রিসিভারটা ও। শিবেন যেন একেবারে পাথর।

লা সুইসাইড করেছে। কে—কে তাকে ফোনে বলল? নির্মলের গলাই যেন মনে হল! ওরা তো এক পাড়াতেই খানতিনেক বাড়ির ব্যবধান দু'জনার বাড়ির মধ্যে।

লা—হ্যালো, নির্মল—এই নির্মল!

বিহ্বল ভাবটা কাটিয়ে উঠে শিবেন ব্যগ্রকণ্ঠে ডাকে, কিন্তু ফোনের কানেকশান তখন কেটে গিয়েছে।

ডায়েল টোন শোনা যাচ্ছে।

শিবেন ক্ষিপ্রহাতে নির্মলের ফোন নম্বরটা ডায়েল করল।

বেশ কিছুক্ষণ বাজবার পর অপর প্রান্তে নির্মলের গলা শোনা গেল।

হ্যালো!

নির্মল?

হ্যাঁ, কে?

আমি—আমি শিবেন, একটু আগে তুই কি বললি?

আমি!

হ্যাঁ তুই তো ফোন করছিলি—

আমি ফোন করছিলাম তোকে? কই না তো!

তুই বললি না আমাকে ফোন করে? এই মাত্র—

কি বলেছি?

প্রমী—মানে আমাদের প্রমীলা সুইসাইড করেছে!

Are you mad! আমি আবার কখন তোকে ফোন বলতে গেলাম যে প্রমীমা সুইসাইড করেছে—আর

কোন্ দুঃখেই বা সে সুইসাইড্ করতে যাবে? স্বপ্ন দে...
নাকি?

তবে কে—কে আমাকে ফোন করল!

কেউ করেনি—তুই বোধ হয় একটু আগে স্বপ্ন দেখছি... ঘুমোচ্ছিলি নিশ্চয়ই, কারণ সাড়ে সাতটার আগে তুই বিছানা থেকে উঠিস না। কথার শেষে একটা হাসির শব্দ কানে এল শিবেনের।

শিবেন আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওদিকে ততক্ষণে নি... ঠক্ করে ফোনটা রেখে দিয়েছে।

নির্মল সকালবেলা উঠে বাসি মুখেই এক কাপ চা নিয়ে একট সিগারেট ধরিয়ে বসেছিল, ঐ সময় শিবেনের ফোন এসেছিল। রিসিভারটা নামিয়ে রেখে নির্মল আবার এসে চেয়ারে বসে টুলটার উপর থেকে চায়ের কাপটা তুলে নিল।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে ছ'টা বাজল।

নির্মল চায়ের কাপে আবার চুমুক দেয়। চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। কয়েক চুমুকে চায়ের কাপটা নিঃশেষ করে সিগারেটটা হাতে ঘরের সামনে রাস্তায় উপরে খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

নির্মলদের দোতলার বারান্দা থেকে দুটো বাড়ীর পরে প্রমীলাদের বাসাবাড়ির দোতলার বারান্দাটা সামান্য দেখা যায়। রেলিংয়ের কিছুটা অংশ আর জাফরীর সঙ্গে লোহার হুকে ঝোলানো ছোট ছোট মাটির টবে মানি প্ল্যাণ্ট ও ফুলের গাছ দেখা যায়।

প্রমীলার বাবা নিরঞ্জন চক্রবর্তী কোন একটা ... করেন, মাইনে বোধ হয় আট-নশো পান। ... সেভেন পড়ে সেই সময় নিরঞ্জনবাবু এ পাড়ায় ... দোতলা ও তিন তলাটা ভাড়া নেন। কাজেই প্র... বসবাস করছে তা বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল।

আলাপ ছিলনা নির্মলের সঙ্গে প্রমীলার। আলাপ হতও না, কারণ চিরদিনই একটু মুখচোরা গোবেচারা টাইপের ছেলে নির্মল মল্লিক! কিন্তু তবুও আলাপ হয়ে গেল একদিন, কয়েক বছর পরে হায়ার সেকেণ্ডারী পাস করে কলেজে পড়তে গিয়ে।

আলাপ হয়ে গেল শিবেনের মাধ্যমে। শিবেন বলেছিল, এই নিনু, ঐ প্রমীলা চক্রবর্তীকে চিনিস? ঐ যে মেয়েটি—আমাদের সঙ্গেই এবারে এই কলেজে ঢুকছে ডিগ্রী কোর্সে, আমাদের সায়েন্স বিভাগেই!

না।

সে কি রে, তোদের পাড়াতেই তো!

তা হবে—

মিস্ চক্রবর্তী—এই যে এদিকে! শিবেনের ডাকে প্রমীলা এগিয়ে এল।

কিছু বলছেন শিবেন বাবু!

হ্যাঁ, এই যে আমার এই বন্ধু নির্মল মল্লিককে চেনেন?

প্রমীলা মৃদু হেসে বলেছিল, না, পরিচয় নেই। তবে উনি আমাদের পাড়াতেই থাকেন জানি। উনি তো এবার দুটো লেটার পেয়েছেন—কেমিস্ট্রি আর ম্যাথামেটিক্সে!

ঐ সময় নির্মল বলেছিল, আপনাকে তাই চেনা-চেনা মনে হচ্ছে দেখা অবধি। আপনি আমাদের পাড়াতেই থাকেন, না?

হ্যাঁ, আপনাদের বাড়ির নম্বর ৪৭—আর আমরা যে বাড়িতে ভাড়া থাকি সেটা ৫০ নম্বর।

সেই আলাপের সূত্রপাত। ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতা তারপর।

হঠাৎ চমক ভাঙল নির্মলের, একটা কালো রঙের পুলিস ভ্যান প্রমীলাদের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে। এ-সময় ওদের বাড়ির সামনে

পুলিস ভ্যান, কি ব্যাপার! নির্মলের মনের মধ্যে যেন তার অজ্ঞাতেই একটা বিদ্যুৎ-চমক খেলে যায়।

একটু আগে শিবেনের ফোনের কথাগুলো মনে পড়ে গেল, প্রমীলা সুইসাইড করেছে!

পুলিস ভ্যানটা থেকে একজন ইউনিফর্ম পরিহিত পুলিস অফিসার নামলেন। চকিতে সম্ভব অসম্ভব অনেক কথাই মনের মধ্যে আনাগোনা শুরু দেয় যেন নির্মলের ততক্ষণে।

প্রমীলা সুইসাইড করেছে?

প্রমীলাদের বাড়িতে মানুষজন খুব বেশী নেই। প্রমীলার মা-বাবা, প্রমিলা ও তার দুই ভাই—সুধীরঞ্জন ও প্রিয়রঞ্জন।

সুধী ওর বড়। বি-কম পাশ করার পর ওর বাবা নিরঞ্জনবাবুই তাঁর অফিসে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। খুব অমায়িক ও রসিক মানুষ সুধীরঞ্জন আর প্রিয়রঞ্জন এবার হায়ার সেকেণ্ডারী দেবে। প্রমীলার বাড়িতে নির্মলের যথেষ্ট যাওয়া-আসা আছে। প্রমীলাও মধ্যে মধ্যে তাদের বাড়িতে আসে।

দোতলা আর তিনতলাটা নিরঞ্জনবাবু ভাড়া নিয়েছেন, আর একতলায় খান তিনেক দোকানঘর। দোকানগুলো এখনও খোলেনি। আর এত সকালে খোলবার কথাও নয়। কাজেই পুলিস যদি এসে থাকে তো প্রমীলাদের ওখানেই এসেছে!

নির্মল তাড়াতাড়ি একটা শার্ট গায়ে চড়িয়ে পায়জামা পরা অবস্থাতেই পায়ে চপ্পলটা গলিয়ে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে একেবারে রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

মাত্র দুটো বাড়ি পরে—

রাস্তায় এখনও লোকজন দেখা দেয় নি। একটা রুটির গাড়ি মহেশ্বেতা রেস্টুরেণ্টার সামনে দাঁড়িয়ে।

॥ দুই ॥

প্রমীলার বাড়িতে ঢুকতে গিয়েই বাধা পেল নির্মল।

বাধা দিল একজন পুলিস সার্জেন্ট।

কাকে চান ?

প্রমীলার সঙ্গে একবার দেখা করব—

প্রমীলা !

হ্যাঁ, প্রমীলা চক্রবর্তী। আমরা ইউনিভারসিটিতে একসঙ্গে পড়ি।

একসঙ্গে পড়েন—তা আপনি বুঝি এই পাড়াতেই থাকেন ?

হ্যাঁ, এই তো দুটো বাড়ির পর—কিন্তু এ বাড়িতে কি হয়েছে ?

একটি মেয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা—সুইসাইড করেছে।

সুইসাইড করেছে ? কে ? কে সুইসাইড করেছে প্রমীলা ? বিস্ময়ে যেন অভিভূত, প্রশ্নটা আপনা হতেই বের হয়ে আসে নির্মলের কণ্ঠ হতে। এবং সে কিছু বলবার আগেই প্রমীলার বড় ভাই সুধীরঞ্জনের কণ্ঠস্বর ভেসে এল—দরজার উপরেই দাঁড়িয়ে সুধীরঞ্জন, কেমন যেন বিহ্বল, বিভ্রান্ত।

এই যে নির্মল ! প্রমীলা আত্মহত্যা করেছে—

আত্মহত্যা করেছে ! কখন—কবে ?

কাল রাত্রে। কেন আত্মহত্যা করল জান কিছু তোমরা ? তোমরা মানে তার ক্লাসের বন্ধুরা—

সুধীরঞ্জনের কথা শেষ হল না—

ইনি কে ?

হঠাৎ ঐ সময় পাশ থেকে থানা-অফিসার চিত্তপ্রিয় মুখার্জীর গলার স্বর শুনে সুধীরঞ্জন ফিরে তাকাল। কখন ইতিমধ্যে চিত্তপ্রিয়

চিত্তপ্রিয় মুখার্জী মাত্র কয়েক মাস হল ঐ এলাকায় থানার ইনচার্জ হয়ে এসেছে। বয়স বেশী নয় মাত্র উনত্রিশ-ত্রিশ হবে।

ও মানে আমার বোন প্রমীলার ক্লাসফ্রেণ্ড নির্মল, এ-পাড়াতেই থাকে।

তখন চিত্তপ্রিয় মুখার্জী নির্মলকে ভিতরে ডাকল।

তা কখন জানা গেল, প্রমীলা সুইসাইড করেছে? সুধীবাবু, আপনি কখন জানতে পারলেন ব্যাপারটা? প্রশ্নটা করে তাকাল নির্মল প্রমীলার দাদার মুখের দিকে।

জবাব দেয় চিত্তপ্রিয়। বলল, ব্যাপারটা একটু peculiar নির্মলবাবু।

Peculiar! কি রকম?

কোন বিষের ক্রিয়াতেই মৃত্যু হয়েছে বোঝা যাচ্ছে। তবে এসব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ আত্মহত্যার আগে চিঠিপত্র লিখে যায়, সেরকম কিছুই পাওয়া যায়নি।

কোনো চিঠিপত্র প্রমীলা লিখে যায় নি?

না। আর তার ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল না, ভেজানো ছিল মাত্র।

কখন জানা গেল ব্যাপারটা?

কথা বলল এবারে আবার সুধীরঞ্জনই। বলল, সবার আগে বাড়ীতে ওই বরাবর ওঠে। তারপর চা তৈরী করে নিজে খায় ও আমাকে দেয় এক কাপ। আমি শেষ রাত্রের দিকে উঠে সামনের পার্কটায় দৌড়তে যাই। ফিরে আসি পাঁচটা নাগাদ। এসে দেখি ওর চা তৈরী হতে আর বেশী দেরি নেই। প্রতিদিনই। কি আজ ফিরে এসে দেখি ওর ঘরের দরজা তখনও বন্ধ! সাধ

ভেবেছিলাম হয়ত এখনও ঘুম ভাঙেনি। কয়েকবার ডাকি নাম ধরে ওর, কিন্তু সাড়া পেলাম না, তখন দরজায় ধাক্কা দিতে গিয়েই দরজা খুলে গেল।

ঘরের দরজা ধাক্কা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খুলে যেতে সুধীরঞ্জন যেন একটু বিস্মিত হয়, কারণ প্রমীলা কখনও তার ঘরের দরজা খুলে শোয় না। ভাল করে তখনও ভোরের আলো ফোটেনি। সেই ঝাপসা আলোয় সুধীরঞ্জন দেখল, প্রমীলা খাটের উপর পড়ে আছে কেমন ত্যারছা ভাবে। মাথাটা ঝুলছে খাটের ধার থেকে, একটা হাতও ঝুলছে, বেণীটা গলার পাশ দিয়ে নেমে এসে ঝুলছে। বিশেষ ঐ ভঙ্গিটাই প্রমীলার সুধীরঞ্জনকে যেন চমকে দেয়। সে থমকে দাঁড়ায়।

তার মন যেন সঙ্গে সঙ্গে বলছিল কিছু একটা ঘটেছে। কিছু একটা অমঙ্গল ঘটেছে—মন বললেও, মানুষের স্বভাবগত ধর্ম সেখানে প্রথমটা অস্বীকার করবারই চেষ্টা করে। তাই সুধীরঞ্জন আরও দু'পা এগিয়ে গিয়ে ডাকে, এই প্রমী, অমন করে পড়ে আছিস কেন রে?

কিন্তু প্রমীলার দিকে কোন সাড়া পায় না।

সুধীরঞ্জন এবারে এগিয়ে গিয়ে বোনের মাথাটা তুলতে গিয়ে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেয়। সুধীরঞ্জনের আর ঘরে থকেতে সাহস হয় না। ঘর থেকে বের হয়ে আসে। নিজের ঘরে এসে কয়েকটা মুহূর্ত কেমন বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপরই সে তার ডাক্তার বন্ধু অমিতাভকে ফোন করে। ফোন পেয়েই আসে এবং প্রমীলাকে পরীক্ষা করে বলে, Sorry, she is dead!

Dead—মানে মারা গেছে?

হ্যাঁ, মনে হচ্ছে, a case of poisoning—আত্মহত্যা!

আত্মহত্যা! প্রমীলা আত্মহত্যা করেছে? সুধীরঞ্জন যেন কেমন

হ্যাঁ সুধী, তুমি বরং এক কাজ কর—থানায় একটা ফোন করে দাও।

কেন, থানায় ফোন করব কেন ?

বুঝতে পারছ না, a case of suicide—পুলিসকে না জানিয়ে মৃতদেহের তো কোন ব্যবস্থা করতে পারবে না। তাছাড়া কোন ডাক্তারই তোমাকে death certificate দেবে না।

অমিতাভই থানায় ফোন করে। থানা অফিসার চিত্তপ্রিয় মুখার্জী সঙ্গে সঙ্গে চলে আসেন। থানা বেশী দূর নয়।

তিনি এসে সব শুনে মৃতদেহ পরীক্ষা করে ডাক্তারের সঙ্গে একমত হন।

সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে যায় সকাল ছটার মধ্যেই।

নির্মল সব শুনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। কিন্তু সে যে ফোনে প্রমীলার মৃত্যু সংবাদটা পেয়েছে ইতিপূর্বেই সে কথা বললে না।

চিত্তপ্রিয় মুখার্জী দু-চারটে মামুলী প্রশ্ন করলেন, তারপর তাকে মুক্তি দিলেন।

নির্মল ওখান থেকে বের হয়ে এল, কিন্তু বাড়িতে গেল না। পকেটে পার্সটা আছে দেখে নিল। তারপর সোজা বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল।

শিবেন—শিবেনের সঙ্গে দেখা হওয়া এখুনি তার একান্ত প্রয়োজন!

দক্ষিণমুখো একটা ট্রামে উঠল সমল নির্মল। শিবেন থাকে কাঁকুলিয়াতে।

এদিকে চিত্তপ্রিয় মুখার্জী মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠাবার

সুধীরঞ্জন তার ঘরের মধ্যে একটা চেয়ারে মুহ্যমানের মত বসেছিল।

কি করবে—এখন তার কি কর্তব্য কিছুই যেন বুঝে উঠতে পারে না।

মা-বাবা ও ছোট ভাই পুরীতে বেড়াতে গিয়েছে। সে আর পুরাতন ভৃত্য বামাচরণ বাড়িতে। বামাচরণ ওদের বাড়িতে অনেক বছর আছে। সে বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাঁদছে।

নিরঞ্জনবাবু ছেলের কাছ থেকে ট্রাঙ্ককল পেয়ে ভুবনেশ্বরের প্লেন ধরে পরের দিনই কলকাতায় চলে এলেন। নিরঞ্জনবাবুর স্ত্রী সবিতা দেবী ঘন ঘন মূর্ছা যেতে লাগলেন।

দুই ছেলে এক মেয়ে—বিশেষ করে মেয়ে জন্মাবার পরই অফিসে পদোন্নতি হওয়ায় প্রমীলাকে সন্তানদের মধ্যে বোধ হয় একটু বেশীই ভালবাসতেন নিরঞ্জনবাবু।

তা ছাড়া সন্তানদের মধ্যে লেখায়-পড়ায় প্রমীলা বেশী ভাল ছিল বলে তার প্রতি নিরঞ্জনবাবুর একটু বেশী পক্ষপাতিত্বও ছিল বোধ হয়। প্রমীলার কখনও কোন দোষই তাঁর চোখে পড়ত না। প্রমীলার সাত বছরের ছোট ভাই প্রিয়রঞ্জন তো দিদির একজন অন্ধ ভক্ত ছিল। তার যত আদর-আবদার ছিল ঐ দিদির কাছে। দুইজনের মধ্যে যেমন ছিল ভাব তেমনি ভালবাসা।

বছর চোদ্দ বয়স প্রিয়রঞ্জনের। সামনের বার হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দেবে। প্রিয়রঞ্জন দিদির আত্মহত্যার সংবাদে একেবারে যেন গুম হয়ে গিয়েছিল।

সমস্ত দিনটা সে বাড়ি থেকেই বেরুল না।

মৃতদেহ মর্গ থেকে সকালে পাওয়া গিয়েছিল। সুধীরঞ্জনই তার বন্ধুবান্ধবদের ডেকে শেষ কাজটুকু করার জন্য শ্মশানে নিয়ে

গিয়েছিল। প্রিয়কেও যেতে বলা হয়েছিল, কিন্তু সে যায়নি। সে ঘরের মধ্যে খিল দিয়ে বসেছিল।

সন্ধ্যার দিকে ঘর থেকে বেরুল প্রিয়রঞ্জন। তারপর বাড়ি থেকে বের হয়ে অন্যমনস্ক ভাবে রাস্তা হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একজনের কথা তার মনে হল, কিরীটী রায়।

কিরীটী রায় ঐ সময় ওদের পাড়াতেই থাকত। তখনও গড়িয়াহাটায় বাড়ি করে কিরীটী উঠে যায়নি।

কিশোর বয়েসের কৌতূহলে সে নিজে যেচে গিয়ে কিরীটির সঙ্গে আলাপ করেছিল এবং প্রায়ই কিরীটির ওখানে সে যেত।

বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণোচ্ছল ঐ কিশোরটিকে কিরীটির খুব ভাল লাগত এবং প্রিয় তার বাড়িতে গেলে কিরীটী বসে বসে গল্প করত প্রিয়রঞ্জনের সঙ্গে।

কিরীটির কথা মনে হতেই প্রিয়রঞ্জন কিরীটির বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। সবে তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে।

গ্রীষ্মকাল। সারাটা দিন অসহ্য গরম গিয়েছে। কিরীটি দোতলায় নিজের বসবার ঘরে বসে কৃষ্ণার সঙ্গে গল্প করছিল। প্রিয়রঞ্জন এসে ঘরে ঢুকল।

কিরীটী ওকে ঘরে ঢুকতে দেখে বলে ওঠে, এই যে প্রিয়বাবু, কটা দিন দেখিনি যে! কিন্তু কিরীটীর কথা শেষ হল না, সে প্রিয়রঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললে, কি ব্যাপার প্রিয়বাবু, তোমাকে যেন একটু চিন্তিত ও অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে—আসেওনি!

আমি এখানে ছিলাম না কিরীটীবাবু—

কোথায় গিয়েছিলে?

পুরী। তারপরই একটু থেমে বললে, জানেন কিরীটীবাবু, দিদি মারা গেছে—

কৃষ্ণা বললে, মারা গেছে! কবে? কি হয়েছিল?

গতকাল। পুলিস বলছে আত্মহত্যা, কিন্তু—

কিন্তু কি প্রিয়বাবু? কিরিটী শুধাল।

আমার মনে হয় আত্মহত্যা নয়, দিদি আত্মহত্যা করেনি—

তবে?

কেউ তাকে হত্যা করেছে বিষ দিয়ে—

বিষ দিয়ে হত্যা করেছে!

নিশ্চয়ই তাই! নচেৎ দিদি কি একটা চিঠিও অন্ততঃ লিখে রেখে যেত না যে সে আত্মহত্যা করছে! আর দিদি আত্মহত্যা করবে আমি ভাবতেই পারি না!

কেন? কিরীটী প্রশ্নটা করে প্রিয়রঞ্জনের মুখে দিকে তাকাল।

কেন করবে বলুন! আপনিই তো কত সময় বলেছেন, বিনা কারণে কেউ কখনও আত্মহত্যা করে না!

তিন

কিরীটী বললে, তা তো ঠিকই—কিন্তু—

কি?

হয়তো এমন কোন কিছু ঘটেছিল, যাতে তোমার দিদি—

না কিরীটীবাবু, দিদি এতটুকু খেয়ালী বা ভাবপ্রবণ ছিল না তা ছাড়া দিদি বলত ভীরু আর দুর্বলেরাই আত্মহত্যা করে। আর কিছু ঘটার কথা বলছেন, কি এমন তার ঘটতে পারে—হাসিখুশি, কৌতুকপ্রিয়, আমুদে—পড়াশুনা নিয়ে সর্বদা থাকত দিদি আপনি তো জানেন।

ব্যাপারটা আসলে সব খুলে বল তো প্রিয়বাবু—

প্রিয়রঞ্জন যা ভাবছিল সব বলে গেল অতঃপর কিরীটীকে।

সব শুনে কিরীটী বললে, তোমার কথাই যদি সত্য বলে মেনে নিই প্রিয়বাবু যে তোমার দিদি আত্মহত্যা করেনি, কেউ তাকে কৌশলে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছে, তাহলে অনেকগুলো প্রশ্ন আমাদের সামনে দেখা দেয়--

কি প্রশ্ন?

প্রথমতঃ এই, যদি কেউ তাকে বিষ দিয়ে হত্যাই করে থাকে, সে বিষ তার প্রতি প্রয়োগ করা হল কি করে? একজন মানুষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা সজ্ঞানে তো আর বিষপ্রয়োগ করা চলে না!

তা যায় না, তবে যদি সে না জেনে সে-বিষ খেয়ে থাকে—

ঠিক। তা হতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে কিছু পানীয় বা খাদ্য-বস্তুর সঙ্গে নিশ্চয়ই সেই মারাত্মক বিষপ্রয়োগ করা হয়েছিল এবং সেই খাদ্যবস্তু বা পানীয় প্রমীলা দেবী না জেনে খেয়েছিলেন। কিন্তু সেক্ষেত্রেও একটা ভাববার আছে—

কি?

যে সেই বিষ খাদ্যবস্তু বা পানীয়ের সঙ্গে দিয়েছিল, সেই ব্যক্তি তোমার দিদির নিশ্চয়ই বিশেষ পরিচিত একজন কেউ ছিল।

কি বলতে চান আপনি?

আচ্ছা প্রিয়বাবু—

বলুন!

তোমার দিদির ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা বান্ধবীদের মধ্যে সকলকেই হয়ত তুমি চেন, তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই তা হলে এমন কেউ ছিল যার প্রয়োজন হয়েছিল তার পথ থেকে তোমার দিদিকে সরানো বা কেউ তাদের মধ্যে বিদ্বেষের বশে ঐভাবে তোমার দিদিকে হত্যা করেছে —যদি অবিশ্যি হত্যাই হয়ে থাকে, মানে তোমার কথাটাই সত্য বলে মেনে নেওয়া হয় যদি—

দিদির বন্ধু-বান্ধবীদের সকলকে আমি চিনি না, তবে কয়েক-জনকে জানি যারা আমাদের বাসায় আসত মধ্যে মধ্যে—

প্রশ্নটা আমি করেছি কেন জান ?

কেন ?

কারণ তোমার কথাই যদি সত্য হয়, তোমার দিদির অজ্ঞাতেই কেউ তাকে বিষপ্রয়োগ করে থাকে, তা হলে সে ব্যক্তি যে কেবল তোমার দিদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাই ছিল তাই নয়, তোমাদের ওখানে তার আসা-যাওয়া তো ছিলই, উপরন্তু চট্ করে তার উপরে সন্দেহ পড়বারও কথা নয়—

কিরীটীবাবু, আমিও ঐ দুর্ঘটনার পর থেকে ঐ কথাটাই ভাবছি। আর সেই কারণেই আপনার কাছে আমি এসেছি। আমার মন বলছে, দিদিকে কেউ হত্যাই করেছে এবং দিদির হত্যাকারীকে যদি কেউ খুঁজে বের করতে পারে তো সে একমাত্র আপনিই। কিরীটী বাবু আপনি একটু চেষ্টা করলেই জানতে পারা যাবে সত্যি ব্যাপারটা।

ঠিক আছে প্রিয়বাবু, তুমি কাল এস। আজকের রাতটা আমাকে একটু ভাবতে দাও।

প্রিয়রঞ্জন চলে যেতে কৃষ্ণা বললে, আহা বেচারী ! দিদিকে ও খুব ভালবাস তো, বড্ড মুষড়ে পড়েছে।

কিরীটী বললে, খুবই স্বাভাবিক কৃষ্ণা। কথাটা বলে কিরীটী পাশ থেকে পাইপটা তুলে নিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করলে।

কৃষ্ণা উঠে পড়ল। রাতের রান্নার সব ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে ঘরে এসে ঢুকে দেখে সোফাটার উপরে হেলান দিয়ে চোখ বুজে আছে কিরীটী। ঘর অন্ধকার।

ঘরের আলোটা সুইচ টিপে জ্বেলে দিয়ে স্বামীকে ঐ অবস্থায় চোখ বুজে একান্ত নিস্ক্রিয়ভাবে বসে থাকতে দেখে কৃষ্ণা বললে,

কি ব্যাপার, আলোটা জ্বালাওনি? অমন চুপচাপ বসে আছ?

কে, কৃষ্ণা! বসো—

মনে হচ্ছে যেন কিছু ভাবছ। প্রিয়বাবুর কথাই ভাবছিলে নাকি।

কারো কোন ভালবাসার ও প্রিয়জনের দুর্ঘটনা ঘটলে, তার অজ্ঞাতেই তার মনের মধ্যে অনেক সময় সত্য এসে উঁকি দেয় কৃষ্ণা। তাই ভাবছিলাম—

কি?

প্রিয়বাবুর মনের মধ্যে যে সন্দেহটা উঁকি দিচ্ছে সেটা হয়ত মিথ্য নয়—কিরীটীর কথা শেষ হল না, ঘরের কোণে ফোনটা বেজে উঠল।

কিরীটী উঠে গিয়ে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিল, কিরীটী রায়—

আমি চিত্তপ্রিয়। মিঃ রায়, টালীগঞ্জ থানা থেকে বলছি।

কি ব্যাপার মুখার্জী?

আপনি নিরঞ্জনবাবুর ছোট ছেলে প্রিয়রঞ্জনকে চেনেন?

হ্যাঁ, ছেলেটি আমার এখানে প্রায়ই আসা-যাওয়া করে। কেন, কি ব্যাপার বল তো?

—একটু আগে সে এসেছিল থানায়—

কেন?

আপনি তো শুনেছেন ওর মুখেই, গত পরশু ওর দিদি প্রমীলা সুইসাইড করেছে বিষ খেয়ে, স্টামাক কন্টেন্টের রিপোর্টও আজ পেয়েছি—হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড্ বিষ পাওয়া গিয়েছে। তা প্রিয়রঞ্জন আমাকে বলছিল, এটা নাকি আত্মহত্যা নয়—মার্ডার, আপনাকেও নাকি সেকথা সে বলেছে—

তাই বলছিল—

পাগল। A simple case of suicide—

মুখার্জী?

বলুন।

তোমার case report আর postmortem report টা আমাকে একবার দেখাবে?

কেন দেখাব না? আপনি দেখতে চান কি—কিন্তু সত্যিই কি ব্যাপার বলুন তো?

ব্যাপারটায় আমি যেন একটু interest পাচ্ছি—তুমি কি এখন থানায় থাকো, গেলে দেখা হবে?

হ্যাঁ আছি, আসুন না।

ঐ এলাকায় থানা-অফিসার হয়ে আসার পরই চিত্তপ্রিয় কর্তকটা যেচে গিয়ে কিরীটীর সঙ্গে আলাপ করেছিল এবং আলাপ হবার পর মধ্যে মধ্যে পরামর্শের জন্যও চিত্তপ্রিয়কিরীটীর ওখানে গিয়েছে।

আধঘণ্টার মধ্যেই কিরীটী থানায় এল।

সম্পূর্ণ কেসের fileটা চিত্তপ্রিয় কিরীটীর সামনে ধরে দিল।

চিত্তপ্রিয় মুখার্জী খুব methodical officer। কোন কিছুর তদন্তে গেলে খুব খুঁটিয়ে তদন্ত করাই তার অভ্যাস।

প্রমীলা চক্রবর্তীর মৃত্যুর তদন্ত করতে গিয়েও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি।

মৃতদেহ ও অকুস্থানের খুঁটিনাটি বর্ণনা, কিছুই তার রিপোর্টে বাদ যায়নি। মৃতদেহের গোটাকয়েক বিভিন্ন অ্যাংগেল থেকে ফটোও তুলে নিয়েছে।

ফটোগুলো দেখতে দেখতে একসময় কিরীটী বললে, মুখার্জী,

হঠাৎ তুমি মৃতদেহের এই ফটোগুলো তুলতে গেলে কেন ? তোমার মনেও কি তাহলে সন্দেহটা কোন সময় জেগেছিল যে কেসটা suicide না হয়ে homicide ও হতে পারে ?

মিথ্যে বলব না মিঃ রায়, তা জেগেছিল—,

কেন বল তো ? মৃতদেহের position দেখেই কি ?

মৃতদেহের position দেখে তো বটেই, তা ছাড়াও আরও কিছু ছিল মিঃ রায়, যেমন ঐ সময় ঐ বাড়িতে প্রমীলা, তাঁর বড় ভাই সুধীরঞ্জনবাবু ও পুরনো চাকর প্রৌঢ় বামা-চরণ ছাড়া আর কেউ ছিল না, ঐ ঘটনার দিন বিকেল চারটে নাগাদ সে যখন বাড়ি আসে। সুধীবাবু পরদিন ভোর চারটে নাগাদ দৌড়াতে যাবার সময় সদর দরজাটা খোলাই দেখতে পায়, যদিও রাত সাড়ে এগারটা নাগাদ সে বাড়ি এলে ঐ বামাচরণই তাকে দরজা খুলে দেয় ও পরে বন্ধ করে দেয়। বিশেষ করে প্রমীলার ঘরের দরজাটা ও সদর দরজাটা খোলা থাকা—এই দুটোই আমার মনে কিছুটা সংশয় জাগিয়েছিল।

আর কিছু অসঙ্গতি তোমার মনে হয়নি, মুখার্জী ?

না। কিন্তু কেন বলুন তো ?

মানে পরের দিন সকালে সুধীরঞ্জন তার বোনকে ডাকতে গিয়ে দেখে তার ঘরের দরজাটা খোলা—ভেজানো রয়েছে ! অথচ দরজা বন্ধ করে শোবারই তার অভ্যাস ছিল শুনলাম !

এমনও তো হতে পারে সেরাত্রে প্রমীলা ঘরের দরজাটা কোন কারণে বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল শোবার আগে—

না মুখার্জী, তা নয়। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতাই বলে, কেউ আত্মহত্যা করবার decision একবার নিলে, সে বাকি কাজটুকু ধীরেসুস্থে করে। মানে শেষ কাজটুকু সে তখন একটা যেন trance-এর মধ্যেই করে যায়। কাজেই দরজা বন্ধ

করবার কথাটা ভুলে যাওয়া প্রমীলার পক্ষে ঠিক যেন গ্রহণীয় মনে হচ্ছে না—

তবে কি—

কি তবে ?

মানে বলছিলাম, ব্যাপারটা কি তবে আত্মহত্যা নয় বলেই আপনার মনে হচ্ছে ?

হ্যাঁ মুখার্জী, যত ব্যাপারটা আমি ভাবছি আমার মনে হচ্ছে যেন it was not a case of suicide !

মানে মার্ডার—কেউ তাকে হত্যা করেছে বিষপ্রয়োগে ?

হ্যাঁ, কিন্তু—

কিন্তু ?

জানি তুমি হয়ত বলবে, কিভাবে কখন তাহলে তাকে বিষ-প্রয়োগ করা হয়ে ছিল ? অবশ্যই সেটা হয়ত তোমরা জানতে পারবে আরও অনুসন্ধান চালালে, তবে একটা কাজ তুমি ভাল করেছ—পরিবারের খুঁটিনাটি নোট করে, মৃতের বিভিন্ন অ্যাংগেল থেকে কয়েকটা ফটো তুলে রেখে। শোন মুখার্জী, তোমার কেস-রিপোর্টটা একবার রাত্রির মত আমি নিয়ে যেতে চাই, তোমার কোন আপত্তি নেই তো ?

না, আপত্তি কিসের ! নিয়ে যান।

॥ চার ॥

রাত্রে আহারাদির পর কিরীটী তার বসবার ঘরে একটা সোফার উপরে বসে প্রমীলার কেস-রিপোর্টটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছিল দ্বিতীয়বার। প্রথম দফায় থানায় বসে কিছুটা আলগা ভাবেই কেস-

রিপোর্টটা পড়ে মনে হয়েছিল, প্রিয়রঞ্জনের সন্দেহটা হয়ত অমূলক নয়—প্রমীলা আত্মহত্যা করেনি, তাকে সম্ভবতঃ হত্যাই করা হয়েছে তীব্র হাইড্রো-সায়ানিক অ্যাসিড বিষপ্রয়োগে এবং কথাটা মনে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিরীটীর সত্যানুসন্ধান শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রমীলার স্টমাক কন্টেন্ট অ্যানালিসিস করে নাকি হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড বিষ পাওয়া গিয়েছে—

প্রমীলা ইউনিভার্সিটির ছাত্রী ছিল। কেমিস্ট্রিতে এম.এস-সি. পড়ছিল। এবং কিছু তার ছেলেবন্ধু ছিল। বিশেষ করে প্রমীলার দাদা সুধীরঞ্জনের জবানবন্দি থেকে তার যে তিনজন বন্ধুর নাম পাওয় গিয়েছে—যেমন শিবেন, নির্মল ও তপনজ্যোতি—তারাও এম. এস-সি-র ছাত্র কেমিষ্ট্রীতে।

প্রথমতঃ এ তিনজন প্রমীলার অনেক বছরের সহপাঠী। সেই সূত্রেই হয়ত ওদের পরস্পরের মধ্যে ভাব ও ঘনিষ্ঠতা কিছুটা গড়ে উঠেছিল। এমনও তো হতে পারে, কিরীটীর মনে হয়, ঐ তিনজনের কারও সঙ্গে প্রমীলার ঘনিষ্ঠতা বিশেষ একটা পর্যায়ে পৌঁছেছিল। মৃত্যুর কোন সূত্র হয়ত সেখানেও জট পাকিয়ে থাকতে পারে!

দ্বিতীয়তঃ ঐ বিশেষ বিষটি ও তার প্রক্রিয়া ঐ তিনজনের অজ্ঞাত থাকবার কথা নয়।

তৃতীয়তঃ ওদের তিনজনেরই প্রমীলাদের গৃহে গতিবিধি ছিল। সেদিক দিয়ে মধ্যে মধ্যে ওরা প্রমীলাদের গৃহে যাতায়াত করলে কোনরকম সন্দেহ সেখানে সহজে না আসারই কথা কারও মনে।

চতুর্থতঃ প্রমীলার মত মেয়ের মনের মধ্যে যদি কোনরকম দ্বন্দ জেগেই থাকত ওদের কাউকে ঘিরে (এবং যেটা এক্ষেত্রে জানা একান্ত প্রয়োজন), তা হলেই বা প্রমীলা হঠাৎ আত্মহত্যা করতে যাবে কেন? বিশেষ করে প্রিয়রঞ্জন তার দিদি সম্পর্কে যা বলেছে তাকে, তাতে করে ব্যাপারটার সম্ভাবনা খুবই কম।

পঞ্চমতঃ মৃতদেহের পজিশন—খোলা ঘরের দরজা ও পরের দিন সকালে খোলা সদর দরজাটা, বাড়িতে মাত্র তিন জনের উপস্থিতি—সমগ্র ব্যাপারটা যেন হত্যার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করছে।

পরের দিন সকালেই কিরীটী রিপোর্টটা জংলীর হাতে দিয়ে থানায় চিত্তপ্রিয়র কাছে পাঠিয়ে দিল। কোথাও বের হল না সারাটা দিন। সন্ধ্যার মুখে প্রিয়রঞ্জন এল।

এস প্রিয়বাবু!

আপনি বলেছিলেন আজ আসতে—

হ্যাঁ, বস। তুমি ঠিকই বলেছিলে প্রিয়বাবু, ব্যাপারটা মনে হচ্ছে আত্মহত্যা নয়—

আপনি—মানে আপনারও তাহলে ধারণা যে আমার দিদিকে হত্যাই করা হয়েছে!

হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে আমিও একমত।

কৃষ্ণা এল ঘরে ঐ সময়, তার দু হাতে কাঁচের গ্লাসে ঠাণ্ডা বেলের সরবৎ। হঠাৎ ঐ সময় প্রিয়রঞ্জন গ্লাসে বেলের সরবৎ দেখে বলে উঠল, কিরীটীবাবু, আপনাকে একটা কথা বোধ হয় আমার বলা প্রয়োজন—

কিরীটী গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বললে, নাও বেলের সরবতটা আগে খেয়ে নাও, তারপর কথা হবে।

কৃষ্ণার হাত থেকে সরবতের গ্লাসটা নিয়েও চুমুক দিল না প্রিয়রঞ্জন, সেটা সামনের টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বললে, দিদি যেদিন মারা যায়, অর্থাৎ সেই দুর্ঘটনার দিন দিদি চারটার সময় বাড়ি আসার ঘণ্টাখানেক পরে নির্মলদা আমাদের বাড়িতে আসে—

জানলে কি করে কথাটা ? কিরীটী প্রশ্ন।

আমাদের বাড়ির যে পুরানো চাকর—বামাচরণদা, সে-ই গতকাল রাত্রে আমাকে বলছিল। কেবল নির্মলদাই নয়, দিদির কাছে আরও একজন এসেছিল সেরাত্রে—

কে সে ?

বিকেল থেকে বামাচরণদার জ্বর-জ্বর হয়েছিল বলে নীচে নিজের ঘরে শুয়েছিল। তখন কত রাত ঠিক বামাচরণদা বলতে পারল না, কলিং বেল বাজতে সে উঠে গিয়ে সদর খুলে দেয় এবং সিঁড়ির প্যাসেজের আলোটা আগের দিন রাত্রে যে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তা সে জানত না, কাজেই অন্ধকারে কে এল তাকে স্পষ্ট দেখতে পায়নি, তবে তার গলার স্বর শুনে ওর মনে হয়েছিল তপনদা—দিদির আর একজন বন্ধু তপনদা উপরে চলে যায়।

তারপর ?

নির্মলদা বোধ হয় রাত দশটা নাগাদ চলে যান। বামাচরণদা টের পেয়েছিল, কারণ দিদি এসেছিল নীচে দরজা বন্ধ করে দিতে।

আর তপনবাবু, তিনি কখন যান ?

বামাচরণদা বলতে পারে না—

আচ্ছা সেরাত্রে তোমার দাদা সুধীবাবু কখন বাড়ি ফেরেন প্রিয়বাবু ?

দাদা সাড়ে এগারোটা নাগাদ ফিরে আসে।

তাকে কে দরজা খুলে দিয়েছিল ?

বামাচরণদা।

পরের দিন যে সকালবেলা সদর দরজাটা খোলা ছিল সে সম্পর্ক বামাচরণ কিছু জানে ?

বামাচরণদা তো কিছু বলেনি সে সম্পর্কে !

বামাচরণ কিছু বলেনি ?

না। আমিও জিজ্ঞাসা করিনি—

প্রিয়বাবু।

বলুন ?

বামাচরণ এখন কি করছে ?

জ্বর হয়েছে, শুয়ে আছে। জানেন কিরীটীবাবু, আপনার এখানে যখন আসছি, পথে নির্মলদার সঙ্গে দেখা। নির্মলদা আমাকে দেখতে পেয়ে, কেমন যেন আমার মনে হয় পালিয়ে গেল!

কেন, পালিয়ে যাবে কেন ?

মনে হল তাই বললাম—

নির্মলবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার, হয়ত অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য তিনি আমাদের দিতে পারবেন!

যাবেন—দেখা করবেন ? নির্মলদাকেও দেখে এলাম বাড়িতেই ঢুকলেন, এখন হয়ত বাড়িতেই আছেন, যাবেন তাঁর বাড়িতে ?

চল। একবার দেখাই যাক—যদি দেখাটা হয়ে যায়, কিছু জানতে পারা যায়!

নির্মলদের বাড়ির নীচের বৈঠকখানায় বসতে বলেছিল প্রিয়রঞ্জন, কিন্তু কিরীটী বললে, না, আমি নীচের রাস্তায় অপেক্ষা করছি তুমি যাও। পার তো নির্মলবাবুকে ডেকে নিয়ে এস।

প্রিয়রঞ্জন দোতলায় নির্মলের ঘরে গিয়ে কিরীটীর কথা বলতেই সে বললে সে কি, রাস্তায় তাঁকে দাঁড় করিয়ে এসেছ কেন ? নীচের বৈঠকখানায় বসাতে পারলে না।

বলেছিলাম কিন্তু এলেন না, রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিন্তু কি ব্যাপার বল তো প্রিয়, উনি হঠাৎ আমার সঙ্গে দেখা করতে চান কেন ?

তা তো জানি না। আজই বলছিলেন আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে চান। তাই নিয়ে এসেছি।

হুঁ। আচ্ছা চল। নির্মল একটা শার্ট গায়ে চাপিয়ে স্যাণ্ডেলে পা গলিয়ে নীচে নেমে এল।

রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়েছিল কিরীটী। নির্মল বললে, শুনলাম প্রিয়র কাছে আপনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান, আসুন বাড়ির মধ্যে।

না নির্মলবাবু, বরং আপনার যদি আপত্তি না থাকে তো চলুন না বড় রাস্তার ধারে পার্কটায় গিয়ে বসা যাক।

পার্কে? বেশ, চলুন।

তিনজনে পার্কে এসে একটা বেঞ্চিতে বসল।

রাত প্রায় পৌনে আটটা হবে গ্রীষ্মের রাত্রির পৌনে আটটা—সন্ধ্যা বললেও চলে। পার্কে তখনও অনেক লোক। যে বেঞ্চটায় ওরা বসল সে জায়গাটা একটু অন্ধকার।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর নির্মলই বললে কি বিষয়ে আপনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান বলুন তো কিরীটীবাবু? নির্মলের কণ্ঠস্বরে খানিকটা দ্বিধা ও খানিকটা উৎকণ্ঠা যেন প্রকাশ পায়।

আচ্ছা নির্মলবাবু, প্রিয়রঞ্জনের দিদি প্রমীলা দেবী তো আপনার সহপাঠি ও বিশেষ পরিচিত ছিলেন?

হ্যাঁ, কিন্তু সেকথা কেন?

আচ্ছা তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারটা আপনার কি মনে হয়?

নিশ্চয়ই শুনেছেন প্রমীলা আত্মহত্যা করেছে—

পুলিসের কিন্তু ধারণা তা নয়—

তাই নাকি?

হ্যাঁ। তাদের ধারণা কেসটা সুইসাইড নয়—হোমিসাইড। হত্যা করা হয়েছে তাঁকে।

সে কি! এ আপনি কি বলছেন কিরীটীবাবু?

শুধু পুলিসের নয়, আমাদের—এই প্রিয়বাবু ও আমারও ধারণা তাই তাঁকে brutally murder করা হয়েছে?

না, না—absurd! হতেই পারে না। তাকে কে আবার হত্যা করতে যাবে? আর কেনই বা হত্যা করবে। It is fantastic?

কে হত্যা করতে পারে তাঁকে আর কেনই বা হত্যা করেছে সেটা যদিও অবিশ্যি এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি, তাহলেও হত্যাকারীকে ধরা দিতেই হবে। যাক সেকথা, আপনার সঙ্গে তো তাঁর পরিচয় ও যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল—আর শুধু তাই নয়, পুলিস জানতে পেরেছে দুর্ঘটনার রাত্রে আপনি তাঁর ওখানে রাত দশটা পর্যন্ত ছিলেন—

কে—কে বললো সেকথা? কার কাছ থেকে পুলিস কথাটা জানল?

তারা জেনেছে। আর কথাটা যে মিথ্যা নয় সে তো আপনিও স্বীকার করলেন!

নির্মল একেবারে চুপ। কয়েকটা মুহূর্তের জন্য একটা স্তব্ধতা।

নির্মলবাবু! কিরীটী তার প্রশ্নটার আবার পুনরাবৃত্তি করল, বেলা পাঁচটা কি সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আপনি প্রমীলার বাড়ি যান, তাই না?

হ্যাঁ।

কতক্ষণ ছিলেন?

রাত সাড়ে দশটার কিছু পরে চলে যাই—

সেরাত্রে আর কেউ প্রমীলার ওখানে গিয়েছিল কি?

হ্যাঁ, তপনজ্যোতি। সে রাত সাতটা নাগাদ এসেছিল—

তপনবাবু কখন চলে যান ?

রাত দশটা নাগাদ।

তারপর তাহলে আপনি যান—

হ্যাঁ।

দরজা বন্ধ করতে প্রমীলা কি আপনার সঙ্গে নীচে এসেছিলেন ?

না—না তো !

তবে কে দরজা বন্ধ করল ?

প্রমীলা বলেছিল সে-ই একটু পরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেবে—

কেন—বামাচরণকে বললেন না কেন সদর দরজাটা বন্ধ করে দিতে ?

তার জ্বর হয়েছিল। সে ঘরে শুয়েছিল—

বাড়ির সদর দরজাটা অত রাত্রে অমন অরক্ষিত রেখে চলে গেলেন ?

প্রমীলাকে কথাটা বলেছিলাম, কিন্তু সে বললে কোন ক্ষতি হবে না।

আপনি যখন চলে আসেন, তখন প্রমীলা কি করছিলেন ?

সে রাত্রে স্নান করত, বাথরুমে স্নান করতে ঢুকেছিল তখন।

Was she expecting someone else that night ?

অত রাত্রে কাকে আবার সে expect করবে! বোধ হয় তখনও তার দাদা সুধীবাবু ফেরেননি, তাই দরজাটা সঙ্গে সঙ্গে নীচে গিয়ে বন্ধ করেনি—

নির্মলবাবু, একটা কথা—প্রমীলার উপরে আপনার কোন দুর্বলতা, মানে—

ভালবাসতাম কিনা তাই জিজ্ঞেস করছেন তো ?

হ্যাঁ।

না। আমার কোন দুর্বলতাই তার প্রতি ছিল না।

আপনাদের আর দুই সহপাঠী—শিবেনবাবু ও তপনজ্যোতি-বাবুর ?

বলতে পারব না—

আচ্ছা প্রমীলা দেবীর হত্যার ব্যাপারে কাউকে আপনি সন্দেহ করেন ?

না, তা ছাড়া তাকে হত্যা করা হয়েছে কথাটা এখনও আমার কাছে রীতিমত অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে।

আর একটা কথা, সেদিন অত সকালে হঠাৎ আপনি প্রমীলাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন কেন ?

একটু যেন চুপ করে থেকে নির্মল বললে, ব্যাপারটা rather একটু funny—

কি রকম ?

সকালবেলা হঠাৎ শিবেন আমাকে ফোন করে বলে, তাকে নাকি একটু আগে আমি ফোন করে বলেছি প্রমীলা আত্মহত্যা করেছে! অথচ আমি সকালে কাউকে ফোনই করিনি।

তা কি জবাব দিলেন তাঁকে ?

ঐ কথাই বললাম। বললাম ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখছিল।

কিন্তু ফোন ছেড়ে দেওয়ার পর কথাটা যেন আমি ভুলতে পারলাম না, আমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল—

তারপর ?

ঐ সময় বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই নজরে পড়ল প্রমীলাদের বাড়ির সামনে একটা কালো পুলিস ভ্যান দাঁড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গেই যেন আমার একটু আগে শিবেনের ফোনের কথাটা মনে পড়ল। প্রমীলা সুইসাইড করেছে! আমার মনের মধ্যে কি রকম একটা আশঙ্কা জাগে। আমি তক্ষুনি জামাটা গায়ে দিয়ে বের হয়ে পড়ি।

তারপর যা যা ঘটেছিল নির্মল বলে গেল কিরীটীকে।

ধন্যবাদ নির্মলবাবু, আপাতত আর আমার কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। চলুন, ওঠা যাক।

কিরীটীবাবু!

বলুন?

আপনি কি সত্যিই মনে করেন যে প্রমীলাকে—নির্মল কথাটা বলতে বলতে থেমে যায়।

হ্যাঁ নির্মলবাবু, তাঁকে কেউ হত্যাই করেছে। একটা কথা নির্মলবাবু—

বলুন?

শিবেনবাবু ও তপনজ্যোতিবাবুর সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে চাই, একটু ব্যবস্থা করতে পারেন?

কেন পারব না—কবে দেখা করতে চান বলুন?

এক কাজ করুন না, কাল বাদে পরশু একটিবার আসুন না তিন বন্ধুতে আমার বাড়িতে বিকেলে! একত্রে চা-পান করতে করতে আলাপ-আলোচনা করা যাবে। কি, অসুবিধা আছে কিছু?

না, অসুবিধা আর কি।

নির্মল পার্ক থেকে বের হয়ে অন্যদিকে হাঁটতে শুরু করল।

প্রিয়বাবু, তোমার দাদা এখন বাড়িতে আছে বোধ হয়?

হ্যাঁ, দাদা বাড়িতেই আছে। দিদির মৃত্যুর পর দাদা খুব গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। আগে আগে ফিরত রাত দশটা সাড়ে দশটায়, এ কদিন দেখছি সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসে—

তাহলে চল, রাত এখনও খুব বেশি হয়নি—তোমার দাদার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।

চলুন না!

॥ পাঁচ ॥

প্রিয়রঞ্জন মিথ্যা বলেনি। প্রমীলার আকস্মিক মৃত্যুর ব্যাপারটা প্রিয়দের বাড়িতে সত্যিই যেন প্রত্যেকের মনে একটা প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল। এবং আঘাতটা যেন সকলকে কেমন একেবারে বিমূঢ় করে দিয়েছিল। প্রমীলা যেন সংসারটার মধ্যে একটা আনন্দের মণি ছিল। তার সদাচঞ্চল হাস্যমুখর স্বভাবটার জন্য বাড়ির প্রত্যেকেই তাকে সত্যিই ভালবাসত।

কিরীটীর সঙ্গে আলাপপ্রসঙ্গে সুধীরঞ্জন সেই কথাগুলোই বলতে বলতে একসময় বললে, আমি এখনও ভাবতে পারছি না কিরীটীবাবু প্রমীলা আত্মহত্যা করল কেন—

সুধীবাবু, কথাটা আপনাকে না বললে অন্যায় হবে তাই বলছি—আমার এবং পুলিসেরও ধারণা, আপনার বোন প্রমীলা দেবী আত্মহত্যা করেননি। তাঁকে কেউ হত্যা করেছে—

কি বলছেন আপনি? না না, তা কি করে হবে? প্রমীলাকে কেউ হত্যা করেছে—

হ্যাঁ, নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে—

কিন্তু কে—কে হত্যা করবে তাকে আর কেনই বা হত্যা করবে?

সে কথাটা নিশ্চয়ই জানা যাবে—জানতে আমরা পারব। আর সেই কারণেই কয়েকটা প্রশ্ন আপনাকে আমি করতে চাই।

সুধীরঞ্জন কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। একসময় ধীরে ধীরে বললে, বেশ। প্রিয়, তুই এ ঘর থেকে যা—

না সুধীরবাবু, ওর যাওয়ার দরকার নেই, ও এ ঘরেই থাকুক।

কিন্তু—

ও সব জানে সুধীবাবু। আর তা ছাড়া প্রমীলা দেবীকে যে হত্যা করা হয়েছে, কথাটা ওরই কিশোর মনে প্রথম জাগে এবং ও আমার কাছে গিয়ে সব কথা বলায় আমার মনের মধ্যেও একটা সন্দেহ দেখা দেয়, আমি ভাবতে শুরু করি—।

প্রিয়—প্রিয় আপনাকে বলেছে যে প্রমীলা আত্মহত্যা করেনি—তাকে কেউ হত্যা করেছে?

হ্যাঁ। যাক আমার যা জিজ্ঞাস্য তা এবার বলি, সেরাত্রে আপনি কখন বাড়ি ফিরে আসেন?

রাত সাড়ে এগারটা নাগাদ—

কি করে বুঝলেন যে তখন রাত সাড়ে এগারটা?

উপরে এসে যখন জামাকাপড় ছাড়ছি হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখি রাত সাড়ে এগারটা—

রাত্রে কে আপনাকে দরজা খুলে দিয়েছিল?

বামাচরণদা—

আপনার ফিরতে অত রাত হয়েছিল যে সেদিন?

এক বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল, বামাচরণ আর প্রমীলা দুজনকেই আমি বলে গিয়েছিলাম যে ফিরতে রাত হবে আমার।

আপনি তো তিনতলার ঘরে থাকেন, সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই বাঁ হাতি দোতলায় প্রমীলা দেবীর ঘর—সে ঘরের দরজটা তখন খোলা ছিল না বন্ধ ছিল, মনে আছে নিশ্চয়ই আপনার!

মনে আছে বৈকি, ঘরের দরজা বন্ধ ছিল—তবে জানালা-পথে আলো দেখা যাচ্ছিল, তাতেই ভেবেছিলাম প্রমীলা হয়ত তখনও জেগেই আছে—

ডাকেননি বোনকে বা সাড়া দেননি?

না। অত রাত্রে আমি আর তাকে ডিসটার্ব করিনি। কারণ ইদানীং তো পরীক্ষার জন্য রাত জেগে পড়াশুনা করত—

পরের দিন সকালে কখন ওঠেন আপনি ?

বরাবরের মত ভোর চারটেয়। উঠে দৌড়তে যান তখন আপনার বোনের ঘরের দরজা বন্ধ ছিল কিনা ?

তাকাইনি দরজার দিকে—

জানালা-পথে রাত্রের মত আলো দেখতে পেয়েছিলেন ?

ঠিক বলতে পারব না, কারণ বোধ হয় জানলার দিকে তাকাইনি—

এবার বলুন, নীচের দরজাটা হা-হা করে খোলা ছিল না ভেজানো ছিল ?

খোলা এবং ভেজানো ছিল।

ভেজানো ছিল।

হ্যাঁ।

তা দরজটা খোলা আছে কেন কিছু মনে হয়নি আপনার ?

না, ভেবেছিলাম গতরাত্রে হয়ত আমি আসার পর বামাচরণদা দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে গেছে ঘুমের ঘোরে। কারণ ও বরাবরই একটু বেশী ঘুম কাতুরে—

তা আপনি যে অত সকালে বের হয়ে যেতেন, দরজাটা কে বন্ধ করত ?

আমিই বাইরে থেকে একটা তালা লাগিয়ে যাই বরাবর।

হুঁ। দরজাটা তাহলে আপনি ভেজানোই দেখেছিলেন ?

হ্যাঁ।

আর সকালে পার্ক থেকে ফিরে এসে প্রমীলা দেবী চা আনছেন না বলে তাঁকে ডাকতে গিয়ে দেখেছিলেন তাঁর ঘরের দরজাটা খোলা, কেবলমাত্র ভেজানো ছিল—তাই না ?

হ্যাঁ।

তাহলে প্রমীলা দেবীর শোবার ঘরের দরজা ও সদর দরজাটা—

দুটোই খোলা ছিল। নির্মলবাবু রাত সাড়ে দশটা নাগাদ চলে গিয়েছিলেন, অবিশ্যি যদি তিনি সত্য বলে থাকেন—

নির্মল! নির্মল সেরাত্রে এসেছিল নাকি? কই সে রকম কিছু তো সেদিন সে বললে না! সুধীরঞ্জন বললে।

পুলিসের ভয়েই বোধ হয় বলেননি। তা ছাড়া কেবল নির্মলই নয়, আরও একজন সে রাত্রে এসেছিলেন। বামাচরণ তাঁকে দরজা খুলে দিয়েছিল—

কে সে?

বামাচরণও অবিশ্যি সে কথা পুলিসের কাছে বলেনি, পরে বলেছে প্রিয়বাবুকে, সে নাকি প্রমীলা দেবীর আর এক বন্ধু, তপনজ্যোতি—

কিরীটী একটু থেমে বললে, বামাচরণের সেদিন জ্বর হয়েছিল, তাই নির্মলবাবু যখন সেরাত্রে এখান থেকে চলে যান, আপনার বোনই নীচে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কথা হচ্ছে এখন তাহলে সে রাত্রে তপনবাবু কখন চলে গিয়েছিলেন? আপনার রাত্রি সাড়ে এগারটায় ফিরবার আগে না পরে? তাছাড়া এর মধ্যে আরও একটা কথা আছে সুধীবাবু—

কি? সুধীরঞ্জন কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

প্রমীলা দেবী রাত্রে যখন নীচে দরজা বন্ধ করতে আসেন, তখন দুজনের কথাবার্তা বামাচরণের কানে গিয়েছিল। তাতে করে তার মনে হয়েছিল, প্রমীলার সঙ্গে সে-সময় নির্মলবাবুই ছিলেন। শুধু গলাই শুনেছে—চোখে দেখেনি তিনি যে নির্মলবাবুই অন্য কেউ নয়, তারও অকাট্য প্রমাণ আমাদের হাতে কিছু নেই।

প্রিয়রঞ্জন ঐ সময় বললে, কিন্তু নির্মলদা তো বলেছিলেন যে তিনিই—

ঠিকই প্রিয়বাবু, কিন্তু নির্মলবাবুর কথাটা যে সত্যি তারই বা প্রমাণ কি

প্রিয়রঞ্জন বললে, কিন্তু মিথ্যে সে বলবে কেন ?

নিজেকে বাঁচাতে !

তবে—তবে কিরীটীবাবু, আপনি কি মনে করেন ?

প্রিয়রঞ্জনকে বাধা দিয়ে করীটী বললে, সেদিন রাত্রে তোমার দিদির কাছে দুজন ছিলেন, প্রিয়বাবু—একজন বিকেল পাঁচটায় এসেছিলেন, তিনি নির্মল বাবু আর দ্বিতীয়জন—

তপনদা !

হতেও পারে, নাও হতে পারে—

মানে ?

মানে তিনি তপনজ্যোতিবাবুও হতে পারেন বা অন্য কেউও হতে পারেন, প্রিয়বাবু!

কিন্তু নির্মলদা তো বললেন যে তপনদা—

তাঁর কথাটা অকাট্য সত্য বলেই বা মেনে নেব কি করে ? তবে এটা ঠিক, ঐ দুজনের মধ্যেই একজন তোমার দিদিকে হত্যা করেছে বিষ প্রয়োগে—

না না, কি বলছেন আপনি কিরীটীবাবু ?

প্রিয়বাবু এখনও তুমি ছেলেমানুষ—তুমি বুঝবে না, যাক সেকথা, বামাচরণকে একবার ডাক তো এ ঘরে প্রিয়বাবু !

একটু পরে বামাচরণকে প্রিয়রঞ্জন ডেকে নিয়ে এল ঘরে।

রোগা ঢ্যাঙা লোকটা। গায়ের রং মিশমিশে কালো। মাথার চুলের প্রায় দু'তিন অংশ পাকা। বয়স ষাট থেকে পঁয়ষটির মধ্যে হবে বলেই মনে হয়।

সুধীরঞ্জনই বললে, বামাচরণদা, উনি যা জিজ্ঞাসা করেন তার জবাব দাও!

বামাচরণ নিঃশব্দে একবার ভীত চোখে কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়।

তোমার নাম বামাচরণ? কিরীটীর প্রশ্ন।

আজ্ঞে কর্তা, বামাচরণ পাড়ুই।

এ বাড়িতে তো তুমি অনেক দিন আছ?

তা কর্তা, চল্লিশ বছরেরও বেশী—

আচ্ছা বামাচরণ, যে রাত্রে তোমার দিদিমণি মারা যায়, সে রাত্রে তোমার তো জ্বর জ্বর ভাব ছিল?

আজ্ঞে। আগের দুদিন থেকেই শরীরটা কর্তা আমার ভাল যাচ্ছিল না, জ্বর-জ্বর ভাব একটা—

ঐদিন বিকেলের দিকে এ পাড়ার নির্মলবাবু তোমার দিদিমণির কাছে এসেছিলেন?

হ্যাঁ।

আর কে কে এসেছিলেন সন্ধ্যার পর?

দিদিমণির আর এক বন্ধু, তপনবাবু—

ঠিক তুমি চিনতে পেরেছিলে তাঁকে? কারণ প্যাসেজের আলোটা ফিউজ হয়ে যাওয়াতে প্যাসেজে আলো ছিল না, অন্ধকারে চিনলে কি করে? ভাল ভাবে তো তাঁকে দেখতেও পাওনি—

না, মানে মনে হয়েছিল তপনবাবুই—

মনে হয়েছিল? তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলে?

না।

কথাও বলনি?

না।

কেন ?

দিদিমণি বলেছিল, তপনবাবুর আসবার কথা আছে, তিনি এলে তাঁকে যেন উপরে পাঠিয়ে দিই। আমি ভেবেছিলাম তপনবাবুই বুঝি এসেছেন, তাঁকে আমি উপরে চলে যেতে বলি। তিনিও সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যান। আমি তখন আবার দরজাটা বন্ধ করে নিজের ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ি।

আচ্ছা বামাচরণ, তোমার দিদিমণি যখন আবার রাত্রে নীচে এসেছিলেন তপনবাবু চলে যাবার সময়, তখন তুমি তোমার দিদিমণি ও তপনবাবুরই গলা শুনেছিলে, তাই না?

হ্যাঁ।

মানে গলা শুনে মনে হয়েছিল তোমার তপনবাবু, তাই তো ?

হ্যাঁ !

এবার বল তো, তপনবাবু কখন আসেন ? রাত তখন কটা হবে ?

নির্মলবাবু আসার বোধ ঘণ্টা দুই পরে—

অত রাত্রে তপনবাবু এসেছিলেন ?

হ্যাঁ।

আর তোমার বড় দাদাবাবু ?

তারও প্রায় ঘণ্টা দেড়েক-দুয়েক পরে বাড়ি ফিরেছেন—

হুঁ। তা নির্মলবাবু তখন ছিলেন ?

ছিলেন কিনা জানি না, কারণ নির্মলবাবু সেরাত্রে কখন যান আমি জানি না ...টের পাইনি, ঘুমিয়ে ছিলাম। দাদাবাবুর ডাকে

... স্বগোতোক্তির মতই বলে, তাহলে দেখা যাচ্ছে, ...চ আটটার মধ্যে কোন এক সময়েই তপনবাবু ...ড়তে। এখন কথা হচ্ছে তিনি কখন চলে গেলেন ?

সে যা বলেছে সেই সময়েই না আরও পরে—সুধীবাবু আসার পর ?

কি বলছেন কিরীটীবাবু ? সুধীরঞ্জন প্রশ্ন করল।

ভাবছি নির্মলবাবু আপনার আসার আগেই চলে গিয়েছিলেন সে রাত্রে, না আপনি আসার পরে ? আগে যদি গিয়ে থাকেন তো কে সদর দরজাটা সেরাত্রে বন্ধ করেছিল ? একমাত্র হতে পারে প্রমীলা দেবীই, আর তা যদি না হয়ে থাকে তো ঠিক আছে—বামাচরণ, তুমি যেতে পার !

বামাচরণ চলে গেল।

কিরীটীও সে রাত্রের মত বিদায় নিল।

॥ ছয় ॥

সেই রাত্রেই আহারাদির পর বাইরের ঘরে পাইপ টানতে টানতে অন্যমনস্ক হয়ে একটা সোফায় বসে কিরীটী, আর অন্য সোফাটায় বসে কৃষ্ণা।

কৃষ্ণাই একসময় প্রশ্ন করে, তখন থেকে কি এত ভাবছ ?

ভাবছি কৃষ্ণা, সেদিন নির্মল ও তপন কেন এসেছিল প্রমীলার ওখানে !

হয়ত ভালবাসার টানে—

ভালবাসার টানে কথাটা যে আমার মনে হয়নি কৃষ্ণা তা নয়, কিন্তু তাতে করে ব্যাপারটা বেশ একটু জটিল হয়ে দাঁড়ায়—

ভালবাসার ব্যাপারটা যে অনেক সময় সত্যিই জটিল হয়, তা তো তুমি জান।

জানি, এ ক্ষেত্রে তাহলে ত্রিকোণ টানা-পোড়েন—তপনজ্যোতি,

নির্মলচন্দ্র ও শিবেন্দ্রকুমার—তিনজনেই মনে হচ্ছে তাহলে ভালবাসত প্রিয়বাবুর দিদিটিকে !

নচেৎ অত রাত্রে যাতায়াত সম্ভব নয় ।

শিবেনবাবুর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে ?

না । আর একটা কথা ভাবছি—

কি ?

আচ্ছা নির্মলবাবুকে ফোন করে বললে কেমন হয় যে, তাঁরা তিন বন্ধু যেন কাল সন্ধ্যার পর আমার এখানে আসার ব্যবস্থা করে—তাতে করে আলোচনাটা সামনা-সামনিই হতে পারে, তিন বন্ধুর উপস্থিতিতেই—

একটা ফয়সলা করতে চাও ?

না, না—ফয়সালা না হলেও কিছু আলোকসম্পাতও তো ব্যাপারটার উপরে হতে পারে !

বেশ তো চেষ্টা করে দেখো। কিন্তু সত্যিই কি মনে করছ ওদের তিনজনের মধ্যে কেউ একজন প্রমীলার হত্যাকারী ?

এতটা এই মুহূর্তে না ভাবলেও ওরা তিনজন আমার মনের মাঝখানে যেন সর্বক্ষণ ঘোরাফেরা করছে। তা ছাড়া কেন যেন আমার মনে হচ্ছে, তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ কারণে প্রিয়বাবুর দিদিকে হয়ত প্রাণটা দিতে হয়েছে—

যাক গে, রাত অনেক হয়েছে—এবারে শোবে চল। কৃষ্ণা বললে।

তুমি যাও, আমি আসছি।

কৃষ্ণা আর দাঁড়াল না।

কিরীটী একটু পরে উঠে এসে খোলা জানালাটার সামনে দাঁড়াল।

প্রমীলাকে যেই হত্যা করে থাকুক বিষপ্রয়োগে, হত্যার কোন

বিশেষ কারণ সে সত্যিই খুঁজে পাচ্ছে না। প্রমীলা সম্বন্ধে যতটুকু জানা গিয়েছে, মেয়েটি হাসিখুশী ও যাকে বলে আনন্দময়ী ছিল।

যদি ঐ তিনজনের কারও সঙ্গে ভালবাসায় পড়েই থাকে বা ওরা তিনজনই যদি ঐ মেয়েটিকে ভালবেসে থাকে, তার মধ্যে নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক কিছু নেই।

তা ছাড়া নির্মলের সঙ্গে দেখাও হয়েছে আর কথাও হয়েছে, কিন্তু তার কথাবার্তা থেকে এমন কিছু পাওয়া যায় নি যাতে তার থেকে প্রমাণ হতে পারে যে নির্মল প্রমীলাকে ভালবাসত, অবিশ্যি কিরীটীও সে ধরণের প্রশ্ন তাকে করেনি।

কাল যদি ওদের তিনজনকে একত্রে পাওয়া যায় তো কৌশলে সে কথাটা জানবার চেষ্টা করতে পারে।

কিন্তু তা কি সম্ভব?

নির্মলের কথায় ওরা কি এখানে আসবে?

তার চাইতে নির্মলের কাছ থেকে তপন ও শিবেনের ঠিকানা যোগাড় করে করে কাল সকালে তাদের সঙ্গে আলাদা ভাবে দেখা করাই বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত হবে

॥ সাত ॥

নির্মলের কাছ থেকে পরের দিন ঠিকানা সংগ্রহ করে নিল কিরীটী সকালেই ফোন করে।

একজন থাকে দেওদার স্ট্রীটে। অন্যজন তালতলায়।

প্রথমে কিরীটী সকাল নটা নাগাদ তপনের ওখানেই গেল দেওদার স্ট্রিটে। একটা পাঁচতলার ফ্ল্যাটবাড়ির দোতলায় একটা

ফ্ল্যাট। তপন তার মামা-মামীর কাছে থেকে পড়াশুনা করে। বরাবর ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট।

বি. এস-সি তে ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড হয়েছিল এবং শুধু পড়া-শুনাতেই নয়—খেলা-ধুলাতেও সে একজন চৌকস। নির্মলের কাছ থেকেই তার বন্ধু তপনের মোটামুটি পরিচয় পেয়েছিল কিরীটী।

তপন বাড়িতেই ছিল এবং কলিং বেলের শব্দে সেই-ই এসে দরজা খুলে দেয়।

আপনি কাকে চান?

তপনবাবুকে। কিরীটী বললে।

আমারই নাম তপন চ্যাটার্জী। কিন্তু আপনাকে চিনতে না পারলেও মনে হচ্ছে চেনা-চেনা—

সে হতে পারে, আমার ছবি দেখেছেন তাই—কিরীটী মৃদু হেসে বললে।

ছবি?

আমার নাম কিরীটী রায়।

কি আশ্চর্য, নমস্কার! আসুন আসুন আসুন কি সৌভাগ্য আমার! আসুন, ভিতরে আসুন—বলতে বলতে দরজার কপাট দুটো একেবারে টান-টান করে খুলে দিয়ে সাদর আহ্বান জানাল।

কিরীটী দেখছিল তপনজ্যোতিকে। তেইশ-চব্বিশের মধ্যে বয়স হবে। নির্মল তার পরিচয় দিতে সামান্য অত্যুক্তিও করেনি। লম্বায় খুব বেশী না হলেও তার সুগঠিত পেশল দেহ সত্যিই যেন দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রথম দর্শনেই। গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যাম। মাথায় কোঁকড়ানো চুল, কিছুটা এলোমেলো। যেমন সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত বড় বড় দুটি চোখ, তেমনি ললাট ও দৃঢবদ্ধ চিবুক। চোখে কালো সেলুলয়েড ফ্রেমের চশমা।

পরনে পায়জামা পাঞ্জাবি। ঘরটা বোধ হয় ড্রয়িংরুম হিসাবেই

ব্যবহৃত হয়। সোফা সেট পাতা। এক কোণে একটা রেডিওগ্রাম—রেডিওতে তখন কার যেন সেতারবাদন চলছিল।

আসুন, বসুন মিঃ রায়। আমার মামীমা কালীঘাটে পুজো দিতে গেছেন। আনন্দে অনর্গল কথা বলে যায় তখন।

কিরীটী একটা সোফায় উপবেশন করার পর তপনজ্যোতি বললে, তারপর বলুন তো হঠাৎ আমার কাছে কেন মিঃ রায়?

কিছু খবরাখবর নেওয়ার জন্যই আপনার কাছে এসেছি তপনবাবু। কিরীটী বললে।

খবরাখবর! কি ব্যাপার?

আপনার সহপাঠিনী ও দীর্ঘদিনের পরিচিত প্রমীলা দেবী—

প্রমীলা! সে—সে তো সুইসাইড করেছে!

হ্যাঁ। তাঁর মৃত্যুর সংবাদটা আমার অজানা নয়।

চোখেমুখে খানিকটা বিস্ময় ও উদ্বেগ নিয়ে তখন চেয়ে আছে তপন কিরীটীর মুখের দিকে

কিরীটী বললে, আপনি বোধ হয় এখনও জানেন না তপনবাবু, প্রমীলার মৃত্যুর ব্যাপারটা পুলিস ঠিক আত্মহত্যা বলে মনে করছে না—

তবে কি?

তাকে হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে।

হত্যা!

হ্যাঁ, তাঁকে খুন করা হয়েছে।

কিন্তু তা কি করে হবে? কে তাকে হত্যা করবে?

সেই ব্যাপারের অনুসন্ধানের জন্যই আপনার কাছে আমি এসেছি—

আমি ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না মিঃ রায়।

বললাম তো আপনাকে এইমাত্র, পুলিসের ধারণা হয়েছে যে প্রমীলা দেবীকে কেউ হত্যা করেছে—

তা যদি হয়ই তো আপনি আমার কাছে এসেছেন কেন ?

এসেছি যে আপনি হয়ত প্রমীলার মৃত্যুরহস্য উদ্ঘাটনের ব্যাপারে আমাকে কিছু সাহায্য করতে পারেন—

তপনজ্যোতি কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে কিরীটী বললে, প্রথমত আপনি যে কেবল তাঁর সহপাঠীই ছিলেন তাই নয়, আপনাদের পরস্পরের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতাও ছিল। আর দুর্ঘটনার রাত্রে আপনি প্রমীলাদের বাসায় গিয়েছিলেন—

কে বললে সে কথা ?

নির্মলবাবু—আপনাদেরই আর এক সহপাঠি ও বন্ধু !

তপনজ্যোতি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, হ্যাঁ, আমি গিয়েছিলাম সেখানে—

কখন গিয়েছিলেন এবং কখনই বা চলে এসেছিলেন ?

গিয়েছিলাম সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ, আর চলে আসি বোধ করি রাত তখন দশটা হবে।

আপনি যখন চলে আসেন, নির্মলবাবু কি তখনও সেখানে ছিলেন ?

হ্যাঁ, সে ছিল।

আচ্ছা আপনি কি জানতেন যে ঐ সময় প্রমীলার মা-বাবা কলকাতায় ছিলেন না ?

জানতাম। তাঁরা পুরী গিয়েছেন বেড়াতে—

তা হঠাৎ সেরাত্রে প্রমীলাদের ওখানে গিয়েছিলেন কেন ?

প্রমীলাই যেতে বলেছিল আগের দিন—

কেন ?

কতকগুলো অঙ্ক বুঝে নেওয়ার জন্য। নির্মল আর প্রমীলাকে আমি অঙ্কগুলো বুঝিয়ে দিয়ে চলে আসি।

আপনাকে সেরাত্রে বামাচরণ দরজা খুলে দিয়েছিল, তাই না ?

হ্যাঁ।

দরজা বন্ধ করেছিল কে, রাত দশটায় যখন আপনি চলে আসেন ?

প্রমীলা। সে-ই নীচে আমাকে পৌঁছে দিতে এসেছিল।

'আপনি মধ্যে মধ্যে প্রমীলার ওখানে যেতেন—ওদের বাড়ির সকলের কাছে আপনি পরিচিত, না ?

হ্যাঁ, যেতাম মাঝে মাঝে।

আচ্ছা প্রমীলার মৃত্যুসংবাদটা আপনি কার কাছ থেকে পান এবং কখন ?

পরের দিন সকাল সাতটা নাগাদ নির্মল আমাকে ফোন করে কথাটা জানায়। বলে, প্রমীলা সুইসাইড করেছে।

আচ্ছা প্রমীলার সঙ্গে আপনার তো বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল ?

সহপাঠি হিসাবে যতটুকু সাধারণত থাকে তার বেশী কিছু নয়—

প্রমীলার আপনার প্রতি মনোভাব কি রকম ছিল ?

বলতে পারব না।

প্রমীলা কাউকে ভালবাসতেন বলে আপনি কিছু জানেন ?

বোধ হয় প্রমীলার মনে শিবেনের প্রতি কিছুটা দুর্বলতা ছিল। শিবেন প্রমীলাকে ভালবাসত।

নির্মলবাবু ? তাঁর কোন দুর্বলতা ছিল প্রমীলার প্রতি ?

ঠিক জানি না—তবে মনে হয় ছিল।

কিরীটি আবার কি প্রশ্ন করতে উদ্যত হয়েছিল কিন্তু করা হল না, কলিং বেলের শব্দ শোনা গেল।

তপনজ্যোতি এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের এক যুবক ঘরে এসে ঢুকল।

দেখ তপন—যুবকটি থেমে গেল হঠাৎ ঘরে কিরীটীকে দেখে।

কিরীটী তাকিয়েছিল আগন্তুকের মুখের দিকে।

রোগা পাতলা চেহারা। লম্বায় প্রায় ছয় ফুটের কাছাকাছি। মাথাভর্তি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল এলোমেলো। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, পায়ে চপ্পল। গাত্রবর্ণ কালোই বলা চলে। কালো হলেও বেশ সুশ্রী।

শিবেন, তুই এসেছিস ভালই হয়েছে। আয় আলাপ করিয়ে দিই—ইনি সত্য-সন্ধানী কিরীটী রায়, আর কিরীটীবাবু, আমাদের একটু আগে যার কথা হচ্ছিল এই সেই শিবেন নন্দী।

ওরা পরস্পর পরস্পরকে নমস্কার করে।

তার পরই আবার তপন বললে, শিবেন, উনি কি বলছেন জানিস?

কি?

প্রমীলা নাকি সুইসাইড করেনি, কেউ তাকে বিষ দিয়ে হত্যা করেছে।

প্রমীলাকে হত্যা করা হয়েছে বিষ দিয়ে? কি বলছিস তুই? না না, it is absurd!

না না শিবেনবাবু, কিরীটী বললে, 'it's a fact—

কিন্তু কেন—কেন তাকে কেউ হত্যা করতে যাবে? শিবেন বললে।

সে প্রশ্নে আমরা পরে আসছি শিবেনবাবু, তার আগে আপনি যদি আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেন।

কি প্রশ্ন?

আপনি ভালবাসতেন প্রমীলাকে?

প্রমীলাকে আমি ভালবাসতাম। হঠাৎ ঐ conclusion-এ আপনি এলেন কি করে? না কেউ এ কথাটা বলেছে?

ভালবাসতেন না?

না, কোন দিনও না।

আপনার কোনরকম দুর্বলতা তাঁর প্রতি ছিল না ?

না।

আর প্রমীলার ?

না, তার যদি কোন দুর্বলতা ছিল তো সেটা বোধ হয় ঐ তপনের পরেই—

কি বলছিস তুই শিবেন। আমার প্রতি তার কোন দুর্বলতাই কোনদিন ছিল না, বরং তোরই প্রতি তার দুর্বলতা ছিল—

বাজে বকিস না তপন—

আর তুই অস্বীকার যতই কর, তোরও দুর্বলতা ছিল তার প্রতি। তুই মনে মনে তাকে ভালবাসতিস।

Don't talk nonsense! ওর মত একটা ফ্লার্ট টাইপের মেয়েকে কোন্ দুঃখে আমি ভালবাসতে যাব ? চঞ্চল অস্থিরচিত্তের একটা মেয়ে—শেষের দিকে শিবেনের কণ্ঠ হতে যেন কিছুটা আক্রোশ ঝরে পড়ে।

শিবেনবাবু! হঠাৎ কিরীটীর ডাকে দুই-বন্ধুই ওর মুখের দিকে তাকাল। কিরীটী বললে, আচ্ছা সেদিন আপনিই তো ফোন করে নির্মলবাবুকে সংবাদটা দেন ?

ঠিক উল্টো—it was নির্মল, সে-ই আমাকে ফোনে সংবাদটা দেয় প্রথমে!

কিন্তু নির্মলবাবু দেননি, আমি জানি। কিরীটী শান্ত গলায় বললে।

নির্মল এখন যতই অস্বীকার করুক, I know—তার গলা আমার যথেষ্ট চেনা it was নির্মল। মাত্র দুখানা বাড়ির পরেই থাকে প্রমীলাদের—তাছাড়া পরে এও জেনেছি সেরাত্রে নির্মল প্রমীলাদের ওখানে অনেকক্ষণ ছিল তাই, না তপন ?

তপন মৃদু গলায় বললে, হ্যাঁ।

আপনিও তো গিয়েছিলেন সেরাত্রে প্রমীলার ওখানে। হঠাৎ কিরীটী বললে।

কে বলেছে? গত এক মাস ত[illegible] ওখানে আমি যাইনি! শিবেন বললে।

যাননি?

না।

শিবেনবাবু, কাল একবার সন্ধ্যার দিকে আমার বাসায় আসবেন?

কেন?

আসুন না। কিছু কথা আছে আপনার সঙ্গে।

বেশ, যাব। আচ্ছা চলি রে তপন।

শিবেন বের হয়ে গেল অনেকটা তাড়াহুড়া করেই।

॥ আট ॥

প্রমীলার ঘরটা তালা দেওয়াই ছিল। প্রমীলার মৃত্যুর পর সুধীরঞ্জনই ঘরের দরজায় একটা তালা লাগিয়ে দিয়েছিল। বাড়ির কেউই অবিশ্যি ঘরটার মধ্যে ঢুকত না একমাত্র প্রিয়রঞ্জন ছাড়া। স প্রায়ই ঐ ঘরটার মধ্যে ঢুকে চুপচাপ ভূতের মত বসে থাকত। প্রিয়রঞ্জন যে তার দিদিকে কত ভালবাসত কারোরই তা অজানা ছিল না। তাই বিশেষ করে সুধীরঞ্জন দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছিল।

অফিস থেকে ফিরে সুধীরঞ্জন তার ঘরের মধ্যে বসে ছিল, একটু আগে সন্ধ্যা হয়েছে, প্রিয় এসে ঘরে ঢুকল, দাদা!

কি রে ?

কিরীটীবাবু দিদির ঘরটা একবার দেখতে চান, চাবিটা দাও।

ড্রয়ার থেকে চাবিটা নিয়ে সুধীরঞ্জন বললে, চল্‌, খুলে দিচ্ছি।

দরজা খুলে তিনজন ঘরে প্রবেশ করল। ঘরটা অন্ধকার। প্রিয়ই সুইচ টিপে ঘরের আলোটা জ্বেলে দিল। পুলিস মৃতদেহ নিয়ে যাবার পর আর কেউ এই চারদিনে এ ঘরের কোন কিছুতে হাত দেয়নি। যেখানকার যা ঠিক তেমনিই আছে। কিরীটী এক-বার ঘরের চারিদিকে তাকাল। একটা সিঙ্গল খাট। বিছানার চাদরটা এলোমেলো হয়ে আছে। মাথার বালিশ দুটোও যথাস্থানে নেই। এক কোণে একটা কাঁচের পাল্লা-ওয়ালা আলমারি। ছোট একটা ড্রেসিং টেবিল, তার উপরে কিছু সাধারণ প্রসাধনের টুকিটাকি জিনিস। ছোট একট টুল আর এক কোণে একটি পড়ার টেবিল। বই খাতা-পত্র চমৎকারভাবে গুছানো। ছোট একটা কাঠের সেল্‌ফ্‌ বইতে ঠাসা।

টেবিলের উপরের বই ও খাতাপত্রগুলো অনেকক্ষণ ধরে নেড়েচেড়ে উল্টেপাল্টে দেখল কিরীটী। তারপর খাটটার সামনে এসে দাঁড়াল। চোখের উপর যেন ভেসে ওঠে চিত্তপ্রিয়র তোলা ফটোর দৃশ্যটা। মৃতদেহের ভঙ্গিটা।

বিছানার চাদর ও বালিশ-তোশক উল্টে উল্টে দেখল কিরীটী। বালিশের ওয়াড়ের মধ্যে থেকে একটা ছোট শিশি পাওয়া গেল। শিশিটার মধ্যে কি একটা সাদামতো সামান্য লেগে আছে। শিশিটা কিরীটী পকেটে রেখে দিল। ব্যাপারটা কিন্তু দুই ভায়ের কারোর চোখে পড়ে না।

প্রিয়বাবু!

বলুন ? প্রিয়রঞ্জন কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়।

বামাচরনকে একবার ডাকত পার ?

কখন পৌঁছান বাড়িতে ?

রাত এগারটা নাগাদ হবে—

কিসে গিয়েছিলেন, ট্যাক্সিতে না হেঁটে ?

হেঁটেই গিয়েছি।

দরজা খুলে দিয়েছিলেন আপনার মামা রমেনবাবু ?

হ্যাঁ।

তিনি কিন্তু অন্যরকম বলেছেন আমার কাছে—

কি বলেছেন ?

আপনার সেরাত্রে ফিরতে অনেক দেরি হয়েছিল, রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ আপনি বাড়ি ফিরে যান—

বলেছে—মামা ঐ কথা বলেছে।

হ্যাঁ।

বাজে কথা। মামা মিথ্যে বলেছে।

মিথ্যে বলবেন কেন ?

কারণ চায় না আমি তার ওখানে আর থাকি—

আ

ঘরে ঢুকে বয়সী তার ছেলেটি লেখাপড়া কিছু শিখল না, মাস্য কাজ করে—আর আমি দুদিন বাদে এম. এস-সি. না। সহ্য করতে পারছে না সে—

আচ্ছু হাসল। তারপর নির্মলের দিকে তাকিয়ে বললে, কাউকে এনিও আমাকে সেদিন মিথ্যে বলেছেন—

না আছি। কি মিথ্যে বলেছি আপনাকে ?

মিথ্যে বলেছেন এই যে, হয় সেরাত্রে আপনি চলে যাচ্ছেন বলে াদৌ যাননি তখন—গিয়েছেন সুধীবাবু ফিরে আসবার পর কোন ক সময়—

মোটেই না। আমি তক্ষুনি সোজা বাড়ি চলে যাই।

হুঁ, আপনি তাহলে হলফ করে বলছেন যে সদর দরজাটা আপনি খুলে রেখেই চলে গিয়েছিলেন সেরাত্রে ?

হ্যাঁ। তারপর হয়ত প্রমীলাই স্নান সেরে নীচে এসে দরজা বন্ধ করে দেয় কোন এক সময়।

না, প্রমীলা যে তা দেয়নি সেটা আমিও কিন্তু হলফ করেই বলতে পারি নির্মলবাবু—

তবে হয়ত বামাচরণই—

না, সেও নয়। আমার অনুমান যদি মিথ্যে না হয় হত্যাকারীই সেরাত্রে আপানার চলে যাবার পর (যদি সত্যিই রাত সাড়ে দশটা নাগাদ আপনি চলে গিয়ে থাকেন) দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল—

হত্যাকারী !

তিন বন্ধুই একসঙ্গে প্রশ্নটা করল।

হ্যাঁ, হত্যাকারী। তপনবাবু, শিবেনবাবু ও নির্মলবাবু আপনাদের মধ্যে একজন অন্ততঃ জানেন সেই হত্যাকারী কে—

আমরা একজন জানি ! তপন কথাটা বলে অন্য দুই বন্ধুর দিকে তাকাল।

হ্যাঁ, জানেন। বলুন কে ? শুনুন পুলিস কিন্তু জানতে পেরেছে সে কে—

কে—কে—কে ? তিনজনেরই প্রশ্ন।

শুনুন তাহলে ব্যাপারটা কি হয়েছিল, আমার যা অনুমান এবার আমি বলি। কিরীটী বলতে লাগল, প্রমীলা সেদিন ফিরে আসে বেলা চারটে নাগাদ। তারপর পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আসেন নির্মলবাবু প্রমীলার ওখানে—এবং সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে আসেন তপনবাবু, এই পর্যন্ত সব ঠিক আছে—

কিরীটী একটু থেমে আবার বলতে লাগল, তপনবাবু বলেছেন সে দিন নাকি প্রমীলার ডাকেই তিনি তাঁর ওখানে যান। তাঁকে ও

নির্মলবাবুকে কতকগুলো অঙ্ক বুঝিয়ে দিতে। এবং অঙ্ক বুঝিয়ে দেবার পর রাত দশটায় তিনি চলে আসেন (তপনবাবুর জবানবন্দি), এবং নির্মলবাবু তারও আধঘণ্টা পরে আসেন (নির্মলবাবুর জবানবন্দি)। উভয়ের উক্তি যদি সত্য বলে মেনে নিই, তাহলে ঐ আধঘণ্টা সময় প্রমীলার ঘরের মধ্যে ওঁরা দুজনই অর্থাৎ প্রমীলা ও তপনবাবু ছিলেন। তখনও সুধীবাবু ফেরেননি। কথা হচ্ছে ঐ সময় বামাচরণ যে এক গ্লাস বেলের পানা প্রমীলার জন্য রেখে গিয়েছিল, সেই পানাটা প্রমীলার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল কিনা। অর্থাৎ গ্লাসটা শেষ হয়েছিল কিনা একমাত্র বলতে পারেন আমাদের নির্মলবাবুই। কি নির্মলবাবু, বেলের পানাটা কি প্রমীলা খেয়ে ফেলেছিল ?

হ্যাঁ, মানে তপন চলে আসার পর কিছুক্ষণ বাদেই বেলের পানাটা শেষ করে সে বাথরুমে যায় স্নান করবার জন্য আর আমি উঠে চলে আসি তাকে বলে—

কিন্তু আমি যদি বলি নির্মলবাবু, আপনি মিথ্যে বলছেন ?

মিথ্যে !

হ্যাঁ, মিথ্যে, তখনও গ্লাসটা নিঃশেষ করেনি প্রমীলা, ভেবেছিল হয়ত স্নান করে এসে শেষ করবে—

আমার সামনে সে গ্লাসটা শেষ করেছিল—

নির্মলবাবু, এই শিশিটা চিনতে পারেন ? বলে কিরীটী ছোট একটা শিশি পকেট থেকে বের করে ওদের সামনে তুলে ধরল, এটা প্রমীলার বালিসের ওয়াড়ের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে—

কিসের শিশি ওটা ? তপন ও শিবেন শুধাল।

এটার গায়েই কিন্তু হত্যাকারীর আঙুলের ছাপ রয়ে গিয়েছে। এটার মধ্যেই ছিল তীব্র বিষ হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড।

হঠাৎ যেন ঘরের মধ্যে একটা বজ্রকের মতই ঠাণ্ডা স্তব্ধতা।

সবাই যেন বোবা একেবারে।

কিরীটী একটু থেমে শান্ত ঋজু গলায় বলল, এটাই হত্যাকারীকে চিহ্নিত করে দেবে কে সেরাত্রে প্রমীলার বেলের পানার গ্লাসে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল তাকে হত্যা করবার জন্য। শুনুন আপনারা, এই শিশির গায়ের আঙুলের ছাপ ফরেনসিক ডিপার্টমেণ্ট তুলে নিয়েছে যেমন, তেমনি নেওয়া হয়েছে কৌশলে আপনাদের আঙুলের ছাপ এবং কার আঙুলের ছাপের সঙ্গে শিশির গায়ের আঙুলের ছাপ মিল আছে জানেন কি আপনারা?

বোবা। সবাই চুপ।

কিরীটী শান্ত গলায় পূর্ববৎ বললে, শিবেনবাবু, আপনার আঙুলের ছাপ—it was you!

তাই বুঝি? হেসে ওঠে শিবেন, তা আমি তো সেরাত্রে প্রমীলাদের বাড়ির ধারেকাছেও যাইনি—

গিয়েছেন। আর কখন গিয়েছিলেন জানেন, নির্মলবাবু চলে আসার পরই। সাড়ে দশটা থেকে পৌনে এগারটার মধ্যে কোন এক সময় আপনার পায়ের শব্দ বামাচরণ পেয়েছিল।

চমৎকার! একবারে টাইম পর্যন্ত আপনি বের করে ফেলেছেন —তা প্রমীলা তো দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল নির্মল চলে আসার পর, আমি ঢুকলাম কি করে?

প্রমীলা আদৌ দরজা বন্ধ করেনি। আপনিই দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং পালাবার সময় পাননি, কারণ আপনাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল প্রমীলার বিষপানের পর মৃত্যু পর্যন্ত—

শুনুন শিবেনবাবু, আপনি যে যাবেন তা প্রমীলা জানত না ঠিকই, কিন্তু অতরাত্রে হঠাৎ আপনাকে দেখে সে বরং খুশিই হয়েছিল, যেহেতু একটা ভুল বোঝাবুঝির জন্য হয়ত আপনাদের উভয়ের মধ্যে মন-কষাকষি চলছিল। অবিশ্যি এটাও আমার

অনুমান। আপনি যখন ঘরে গিয়ে ঢোকেন, নির্মলবাবু বের হয়ে যাবার পরই, প্রমীলা সম্ভবতঃ তখন বাথরুমেই ছিল। সেই ফাঁকে আপনি কাজ সেরে বের হয়ে আসার আগেই প্রমীলা বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে। বেচারী জানতেও পারেনি তার জন্য তীব্র বিষ গ্লাসের পানীয়ের মধ্যে মিশ্রিত হয়ে আছে এবং সে বিষ ঢেলে দিয়েছে গ্লাসে তারই দয়িত আপনি। ভুল—মহাভুল করেছেন আপনি শিবেনবাবু, প্রমীলা ভালবাসত আপনাকেই, নির্মলবাবুকে নয়—

না, না। চিৎকার করে ওঠে হঠাৎ শিবেন, সে নির্মলকেই ভালবাসত।

না, আপনাকে। প্রমীলার মত মেয়েকেও আপনি চিনতে পারলেন না, শিবেনবাবু!

হঠাৎ ঐমুহূর্তে শিবেন পকেট থেকে কি বের করে মুখে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঢলে পড়ে গেল।

কিরীটী তাড়াতাড়ি উঠে ছুটে গেল শিবেনের সামনে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তাকে পরীক্ষা করে বললে, সব শেষ। বেচারী।

পরের দিন প্রিয়রঞ্জনের প্রশ্নের উত্তরে কিরীটী বলছিল, 'প্রথমটায় নির্মলকেই আমি সন্দেহ করেছিলাম প্রিয়বাবু। পরে টেলিফোনের ব্যাপারটা ও শিশিটাই আমাকে হত্যাকারীর দিকে আঙুল তুলে দেখায় এবং ঐ দুটো মারাত্মক ভুল না করলে তাকে ধরাও যেত না এত তাড়াতাড়ি।

ভুল কেন বলছেন কিরীটীবাবু?

ভুলই তো। প্রমীলার মৃত্যু-সংবাদটা প্রথমতঃ সবাইত জানতে পারত একটু পরে। সাততাড়াতাড়ি তবু শিবেন ফোন করেছিল

নির্মলকে—নিজের দিক থেকে একটা আত্মতৃপ্তি পাবার জন্যে, যেহেতু তার ধারণা হয়েছিল, প্রমীলা নির্মলকেই ভালবাসে। দ্বিতীয়তঃ, ব্যাপারটাকে একটা আত্মহত্যার ব্যাপার বলে দাঁড় করাবার জন্যে সে যদি শিশিটা বালিশের ওয়াড়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে না আসত! কেউ কি আত্মহত্যা করতে গিয়ে আত্মহত্যা করবার বিষটা বালিশের ওয়াড়ের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখে প্রিয়বাবু! সেই কারণেই ঐ শিশির গায়ের ছাপ নেবার আমি ব্যবস্থা করি। ওদের তিনজনের আঙুলের ছাপও কৌশলে সংগ্রহ করে নিই। এবং শিবেনের আঙুলের ছাপের সঙ্গে শিশির গায়ের আঙুলের ছাপটা মিলে যাওয়াই প্রমাণ করে দিল আমার অনুমান সত্য।

কাজ শেষ করার পর সম্ভবতঃ শিবেন যখন বের হয়ে আসছে, সে সুধীবাবুর জুতোর শব্দ শুনতে পায়। প্রমীলার ঘরের দরজাটা সে আটকে দেয়, কিন্তু তাড়াতাড়িতে আলোটা নেভাতে ভুলে যায়। সুধীবাবু তাই প্রমীলার ঘরের দরজা বন্ধ দেখলেও জানালাপথে আলো দেখতে পান এবং সুধীবাবু তাঁর ঘরে ঢুকবার পর নিঃশব্দে শিবেন সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে দরজা খুলে বের হয়ে যায়। দরজাটা খোলাই থাকে।

কিরীটী থামল।

প্রিয়রঞ্জনের চোখে জল।

২

ফোনের রিসিভারটা হাতে করেই সুভাষ বসে রইল।

রিসিভারটা যে ফোনের উপর নামিয়ে রাখবে তাও যেন ভুলে গিয়েছিল সুভাষ।

রিসিভারটা হাতের মধ্যেই ধরা থাকে।

আর সুভাষ শয্যার উপর বসে থাকে।

গীতা মারা গিয়েছে।

প্রতুল বলল, গীতা সুইসাইড্ করেছে—আত্মহত্যা করেছে গীতা।

কিন্তু কেন ?

গীতা সুইসাইড করতে যাবে কেন ? মাত্র তো কয়েক ঘণ্টা! রাত বারোটার পর গীতার বাড়ি থেকে ওরা তিন বন্ধু বের হয়ে গেছে, হাসিমুখে শুভরাত্রি জানিয়ে রাত্রির মত বিদায় নিয়ে।

আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন ছিল, টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছিল।

গীতা থাকে বালিগঞ্জে, আর ওরা তিনজনই থাকে উত্তর কলকাতায়। সুভাষ ফড়িয়া-পুকুরে, প্রতুল বিডন ষ্ট্রীটে আর কুণাল শ্যামপুকুর ষ্ট্রিটে।

গত রাত্রে বাস-ট্রাম সবই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সুভাষই তার গাড়িতে করে দুই বন্ধু প্রতুল ও কুণালকে যে যার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে রাত দেড়টায় বাড়ি ফিরে এসে শুয়ে পড়েছে।

গাড়িটা পোর্টিকোতেই এখনও পড়ে রয়েছে, গ্যারাজ করা হয়নি।

গ্যারাজ করবে কি গাড়ি, ঘুমে তখন তার দু'চোখ জড়িয়ে আসছে। বাড়িতে সবাই তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ভাগ্যি সদরের একটা ডুপলিকেট চাবি তার কাছে থাকে! দরজা খুলে সোজা

এসে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ে। তাহলেও সীতারাম টের পেয়ে গিয়েছিল ও যখন ঘরের দরজা খুলছে। ওর ঘরের কাছে বারান্দায়ই সীতারাম বরাবর শোয়।

সীতারামের ঘুমটাও পাতলা!

দরজা খোলার শব্দ পেয়েই সীতারাম ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কে, দাদাবাবু?

হ্যাঁ রে।

এত রাত হল ফিরতে?

নীচের ল্যানডিংয়ের গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লকটায় ঢং করে তখন রাত দেড়টা বাজল।

কটা বাজল?

রাত দেড়টা।

সীতারামের প্রশ্নের জবাবে বলেছিল সুভাষ।

অনেক রাত করে কাল শুয়েছিল বলেই বোধ হয় সকাল সকাল ঘুমটা ভাঙেনি সুভাষের।

নচেৎ সাধারণতঃ সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যেই ঠিক ঘুম ভেঙে যায় সুভাষের।

আজ অনেকটা বেলা হয়ে গিয়েছে।

খোলা জানালাপথে রোদ এসে ঘরে ঢুকেছে। কালকের মেঘলা আকাশ আর নেই।

মেঘমুক্ত পরিষ্কার নীল আকাশ।

সামনেই টেবিলের উপরে হাতঘড়িটার দিকে তাকাল সুভাষ। বেলা সোয়া আটটা।

এখনও হয়ত ঘুম ভাঙত না। মাথার কাছে টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং শব্দেই ঘুমটা ভেঙেছে।

গীতা নেই।

হঠাৎ কথাটা যেন আবার মনে পড়ে গেল। একটু আগে প্রতুলই তাকে ফোনে সংবাদটা দিল।

গীতাকে তার ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে—মনে হচ্ছে সুইসাইড্‌ই করেছে।

আত্মহত্যা।

পাশেই ছোট একটা টেবিলের উপরে বিষের শিশি একটা পাওয়া গিয়াছে। একটা আইলোশনের শিশি। নীচে লেখা পয়জন—বিষ!

প্রতুল ফোনে জিজ্ঞাসা করেছিল, একবার যাবি না ওখানে?

সুভাষ কোন জবাব দেয়নি।

জবাব দেবে কি সে! বিমূঢ়, কেমন যেন বোবা হয়ে গিয়েছে সুভাষ।

একসময় বিমূঢ় ভাবটা যখন কাটে সুভাষ হাতের রিসিভারটা ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখল।

ফোনটা নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গেই আবার বেজে উঠল। আবার রিসিভারটা তুলে নিল সুভাষ।

সুভাষ—

বল।

কি রে, কোন কথা না বলে কানেকশনটা কেটে দিলি? যাবি না গীতার ওখানে?

তুই কার কাছে শুনলি যে গীতা—

গীতার চাকর শম্ভু ফোন করেছিল, সেই-প্রথমে জানতে পারে ব্যাপারটা। পুলিস এসেছে বাড়িতে। ও আর সৌদামিনী মাসী ছাড়া তো কেউ নেই। ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছে।

ভয় পেয়েছে?

শম্ভু ভয় পেয়েছে কেন? সুভাষ প্রশ্ন করে।

ভয় পাবে না! কি রকম একটা unexpected ব্যাপার। শোন, তুই বরং আমার বাড়িতে চলে আয়, আমি কুণালকেও একটা সংবাদ পাঠাচ্ছি আমার বাড়িতেই আসতে, তিনজনেই যাব।

সুভাষ কোন জবাব দেয় না।

কি রে, আসছিস তো?

আসছি।

প্রতুল ফোন ছেড়ে দেয়। সুভাষ রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

গীতা সুইসাইড্—আত্মহত্যা করেছে!

কিন্তু কেন? তার মত শান্ত ধীর প্রকৃতির মেয়ে কোন দিন আত্মহত্যা করতে পারে সুভাষের যেন চিন্তারও অতীত ছিল।

গীতাকে তো ওরা এক-আধদিন নয়, প্রায় গত পাঁচ বছর থেকে চেনে। ওদের দলে গত পাঁচ বছর ধরে একসঙ্গে এক পার্টিতে কাজ করছে।

যেমন শান্ত ধীর গীতা তেমনি কোন সেন্টিমেন্টেরও ধার ধারে না। জীবনটাকে সে সহজ অনাড়ম্বর ভাবেই নিয়েছিল।

বড়লোক বাপের একমাত্র মেয়ে।

বাপ শহরের নামকরা ডাক্তার। বর্তমানে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে পণ্ডিচেরীতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন বছর তিন হল। গীতার মাও সেখানে।

এক ছেলে এক মেয়ে—শান্তনু ও গীতা। শান্তনু বড়, শহরের নামকরা একজন সার্জন।

দিন পাঁচেক হল নেপালে রাণা ফ্যামিলির কার একটা অপারেশনের ব্যাপারে গিয়েছে। আজ-কালই ফেরার কথা।

ভাই-বোন কেউ বিয়ে করেনি।

বাড়িতে ঠাকুর, ড্রাইভার, দারোয়ান, বুড়ী ঝি মানদা ও শম্ভুচরণ আর অভিভাবিকা প্রৌঢ়া সৌদামিনী মাসী। সৌদামিনী মাসী

নিঃসন্তান বিধবা। বিধবা হবার পর থেকেই গত পনেরো-ষোল বছর বোনের কাছেই আছে। বোন ও ভগ্নীপতি সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে পণ্ডিচেরী চলে যাবার পর বাধ্য হয়ে সৌদামিনী মাসীকেই সংসারের হালটা ধরতে হয়েছে।

সংসার তো ভারী!

পয়সার অভাব নেই, কলকাতা শহরে বাড়ি গাড়ি ব্যাঙ্কব্যালেন্স কোন কিছুরই অভাব নেই।

শান্তনুও প্রচুর উপার্জন করে।

গীতা এম-এ পাস করে পাটি করে বেড়ায় এবং এক বেসরকারী কলেজে অধ্যাপিকা।

মাসী অনেক চেষ্টা করেছে ভাই-বোনকে বিয়ে দেবার। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে শান্তনু। বলে, বুঝি মাসী, বিয়ে একটা করা উচিত আর ইচ্ছেও ষোল আনা-আছে, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে—

তার আবার মুশকিলটা কি? বিয়ে করলেই তো হয়! মাসী বলে।

মুস্কিল হচ্ছে গীতা।

গীতা!

হ্যাঁ। ও বিয়ে করলেই আমি নিশ্চিন্ত। ঝাড়া হাত-পা হয়ে একেবারে সটান গিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পারি।

গীতা পাশেই ছিল, সে মুখ ভেংচে বলে ওঠে, ওঃ, কী দরদ রে! গীতা না বিয়ে করলে উনি বিয়ে করতে পারছেন না! মনে করলেই তো হয় গীতার বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

সেটা শান্তনুর ব্যাপারেও মনে করে নিলে হয়।

সত্যি দাদামণি, বিয়ে কর না একটা। একটা বেশ sweet বৌদি আসবে।

আর আমার বুঝি একজন ভগ্নীপতির শখ নেই!

ইতর—, গীতা বলে ওঠে।

ক্রুয়েল—, শান্তনু জবাব দেয়।

হিপক্রিট্!

আনসিমপ্যাথেটিক!

কাওয়ার্ড!

আনসোস্যাল!

কথা-কাটাকাটি করতে করতে ভাই-বোন একসময় ক্ষান্তি দিয়েছিল।

গীতাই হাসতে হাসতে পরের দিন সবিস্তারে ব্যাপারটা বর্ণনা করেছিল ওদের তিন বন্ধুর কাছে।

সত্যি, দাদামণিটা ভারি ইন্টারেস্টিং।

ঐ সময় হঠাৎ প্রতুল বলেছিল, কিন্তু সত্যি গীতা, তোমার ব্যাপারটা কি বল তো?

কিসের ব্যাপার?

বিয়ে কি সত্যিই তুমি করবে না নাকি?

করব না কবে আবার বললাম।

তবে?

কি তবে?

করছ না কেন?

মনের মত স্বামী জুটবে তবে তো। যার-তার হাত ধরে তো আর বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে বসে পড়তে পারি না।

প্রতুল বলেছিল আবার, কেন, আমাদের পার্টিতেও এত ছেলে রয়েছে—মিত্রা, রেবা, রীতি ওরা তো পার্টির ছেলেদেরই বিয়ে করল।

করেছে বটে, তবে ভুল করেছে।

ভুল!

হ্যাঁ কমরেডদের ভিতর থেকে বিয়ে করা উচিত হয়নি। কারণ

পার্টি-পলিটিকস্ ও সংসার-পলিটিকস্ সম্পূর্ণ ছুটো আলাদা ব্যাপারকে এক জায়গায় এনে দাঁড় করানো ওদের বুদ্ধির কাজ হয়নি।

কুণাল ঐ সময় বলেছিল, কিন্তু কারও প্রতি কারও যদি ভালবাসা হয়ই—

একটা কথা ভুলে যেও না কুণাল, পার্টির কর্মী হলেও প্রত্যেকে মানুষ, মেসিন নয়। এবং কতকগুলো জায়গায় তাদের সংসারের আর দশজন মানুষের সঙ্গে কোন তফাত নেই।

ল্যান্সডাউন যখন পুরোপুরি ল্যান্সডাউন হয়নি, গীতাদের বাবা ডাঃ সুকান্ত চক্রবর্তী এসে জায়গা কিনে বাড়ি তৈরী করেছিলেন।

তারপরে অবিশ্যি ক্রমে ক্রমে বহু ঘর-বাড়ি তৈরী হয়ে জমজমাটি হয়ে ওঠে।

বাড়ির নাম নিরালা।

তিনতলা বাড়ির মধ্যে অনেকগুলো ঘর।

একতলায় খান-ছুই ঘর নিয়ে শান্তনুর চেম্বার এবং বাকি ছুটো ঘরে গীতাদের পার্টির আড্ডা।

নন-রেজিস্টার্ড শাখা-অফিস।

দোতলার ছুটো পাশাপাশি ঘরে একটাতে থাকেন সৌদামিনী মাসী আর একটায় গীতা বাকি সব খালিই পড়ে।

তিনতলায় শান্তনুর আড্ডা।

ব্যাপারটা অবিশ্যি দাসী মানদাই প্রথমে জানতে পারে। সাধারণতঃ বেলা করে কখনও ওঠে না গীতা। কিন্তু বেলা সাতটা বেজে গেল, গীতা ওঠেনি, দেখে মানদা ডেকে তুলতে গিয়েছিল দিদিমণিকে।

ঘরের দরজা খোলাই ছিল—মাত্র ভেজানো।

ভেজানো দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকেই মানদা কেমন যেন থমকে দাঁড়ায়।

শয্যাটা এলোমেলো। আড়াআড়ি ভাবে গীতা শয্যায় শুয়ে।

একটা হাত অসহায় ভাবে খাটের পাশ দিয়ে ঝুলছে, অন্য হাতটা ছড়ানো।

চোখ দুটো যেন ঠেলে বের হয়ে আসছে, মুখটা ঈষৎ হাঁ করা। ডানদিকের কষ বেয়ে ক্ষীণ একটি রক্তের ধারা।

তবু সামনে গিয়ে দাঁড়ায় মানদা এবং বুঝতে পারে গীতার দেহে প্রাণ নেই।

তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটে আসে।

সোজা একেবারে একতলায়। শম্ভু ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে উপরে যাচ্ছিল গীতার ঘরে।

শম্ভু! চিৎকার করে ওঠে মানদা।

কি হল? চমকে ফিরে তাকায় শম্ভু।

ওটা রাখ, শীগ্‌গির ওপরে চল।

কেন? কি হয়েছে?

দিদিমণি—

কি হয়েছে দিদিমণির?

মরে গেছে।

সে কি!

হ্যাঁ—চল শীগগিরি—

শম্ভু তাড়াতাড়ি ছুটে তখুনি উপরে যায়। গীতার ঘরে ঢুকে গীতার দিকে চেয়ে সেও বুঝেছিল গীতা বেঁচে নেই, তবু সে বাড়ির পারিবারিক প্রৌঢ় চিকিৎসক ডাঃ সান্যালকে ফোন করে দেয়।

ডাঃ সান্যাল এসে দেখেন, শয্যার উপরে একপাশে একটা খালি পয়জন আইলোশনের শিশি পড়ে আছে।

ব্যাপারটা সুইসাইড্ ভেবে তিনিই তখন নিকটবর্তী থানায় পুলিস অফিসারকে ফোনে সংবাদ দেন।

অল্পক্ষণের মধ্যে পুলিস এসে পড়ে।

নানারকম জেরা করে শম্ভু ও মানদাকে জানতে পারেন. থানার ও. সি. মিঃ দত্তরায়, গতকাল অনেক রাত্রি পর্যন্ত গীতা তার পার্টির বন্ধু সুভাস, কুণাল ও প্রতুলকে নিয়ে আড্ডা দিয়েছে।

শম্ভু জানত গীতার ঐ তিনজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কথা।

তখন সে প্রতুলকে ফোন করে।

প্রতুল এসে পৌঁছাল বেলা তখন সাড়ে নটা।

থানার ও. সি. দত্তরায় তখন গীতার শয়নঘরের পাশের ঘরে বসে মানদার জবানবন্দি নিচ্ছিলেন, সৌদামিনীর জবানবন্দি শেষ করে।

সৌদামিনী বিশেষ কিছু বলতে পারেনি।

বয়স হয়েছে, তাছাড়া ইদানীং চোখে ছানি পড়ায় ভাল দেখতে পায় না। বাতও আছে। কদিন ধরে বাতে কষ্টটা বেড়েছে।

গতকাল তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিল। গীতা ঐ সময় নীচের তলায় তার বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দিচ্ছিল।

মানদা তার জবানবন্দিতে বললে, দিদিমণি তার বন্ধুরা রাত সাড়ে দশটা নাগাদ নীচের ডাইনিং হলে বসে একত্রে খাওয়া-দাওয়া করে। গীতা নিজে মার্কেট থেকে মাংস এনে রান্না করেছিল।

খাওয়া-দাওয়ার পরে আবার ওরা বাইরের ঘরে গিয়ে বসে। বাইরে তখন বেশ বৃষ্টি পড়ছে।

মানদা ডাইনিং টেবিল পরিষ্কার করে শুতে চলে যায়। তারপর সে আর কিছু জানে না। কখন দিদিমণির বন্ধুরা কত রাত্রে গিয়েছে, গীতা শুতে গিয়েছে—

কোথায় তুমি শোও ?

নীচের তলায় একটা ঘরে।

অতঃপর শম্ভুচরণের ডাক পড়ল। এই বাড়িতে সেই-সব চাইতে বেশীদিন ধরে কাজ করছে।

দাদাবাবু দিদিমণি যখন বলতে গেলে বাচ্চা তখন থেকে।

সে শোয় উপরেই একটা ঘরে।

দত্তরায় প্রশ্ন করেন, তুমি কখন কাল রাত্রে শুতে যাও?

রাত বারোটা।

অত রাত হল কেন?

শুয়ে পড়েছিলাম, দিদিমণি ডেকে কফি দিতে বলল। কফি দিয়ে শুতে শুতে রাত বারোটা হয়ে যায়।

দিদিমণির বন্ধুরা কখন যায় জান? কত রাত হয়েছিল তখন?

ঠিক বলতে পারব না হুজুর, তবে কফি খাবার কিছু পরেই।

তখন তুমি কি করছিলে? শুয়ে পড়েছিলে কি আবার?

আজ্ঞে না। বসে একটা বিড়ি খাচ্ছিলাম। দিদিমণি ওদের বিদায় দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে তার ঘরে গেল।

তারপর?

আজ্ঞে আমার মনে পড়ছে একটা কথা, দিদিমণি বোধ হয় উপরে এসে আবার নীচে গিয়েছিল।

কখন?

মনে হয় ঘণ্টাখানেক পরে।

কি করে বুঝলে?

সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসবার পায়ের শব্দ পেয়েছিলাম।

সে যে তোমার দিদিমণিই কি করে বুঝলে? অন্য কেউ তো হতে পারে?

তা হতেও পারে। কিন্তু আর কে হবে? মাসীমা তো কখন শুয়ে পড়েছেন—মানদাও শুয়ে পড়েছিল। আমিও আমার ঘরেই ছিলাম। তাই মনে হয় দিদিমণিই।

দত্তরায় অতঃপর আরও কয়েকটা মামুলী প্রশ্ন করে শম্ভুচরণকে নিষ্কৃতি দিলেন।

প্রতুল, সুভাষ ও কুণাল ঐ ঘরেই দাঁড়িয়েছিল। এবারে তাদের কয়েকটা প্রশ্ন করলেন।

একটা প্রশ্ন বিশেষ করে তিনজনকেই জিজ্ঞাসা করলেন, গীতার সঙ্গে তো তাদের অনেক দিনের পরিচয় ঘনিষ্ঠতা, সুইসাইড্ করবার মত কোন কারণ ছিল কিংবা ঘটেছিল কিনা গীতার ?

তিনজনেই বলে, না।

প্রতুল বললে, গীতা সুইসাইড্ করতে পারে কথাটা যেন এখনও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না মিঃ দত্তরায়। She was full of life and energy—তার কোন অভাব ছিল না বা কোন problemও ছিল না, তবে কেন সে সুইসাইড্ করতে যাবে !

মিঃ দত্তরায় তখনকার মত মৃতদেহ মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করে বিদায় নিলেন।

॥ দুই ॥

পরের দিন সকালেই জরুরী তার পেয়ে গীতার দাদা শান্তনু প্লেনে কলকাতায় ফিরে এল। গীতার আকস্মিক মৃত্যুসংবাদটা যেন তাকে কেবল মর্মাহতই নয় যেন বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। আইলোশনের শিশিটা গীতারই চোখে দেবার জন্য ডাক্তার প্রেসক্রাইব করেছিল।

সবাই বলছে, গীতা সুইসাইড্ করেছে ঐ বিষাক্ত লোশন খেয়ে! কিন্তু কেন ? কোন্ দুঃখে সে সুইসাইড্ করতে যাবে ? বোনকে তো সে কোনদিন এতটুকু অনাদর করেনি, তার কোন কাজে কোন দিন বাধা দেয়নি, কখনও ভুলেও এতটুকু তিরস্কার করেনি —তবে ?

তাছাড়া গীতার মত বুদ্ধিমতী, বিবেচক, প্রাণচঞ্চল মেয়ে আত্মহত্যা করেছে—কথাটা যেন ভাবাও যায় না।

নিজের ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসেছিল শান্তনু। দত্তরায় এলেন।

শান্তনুবাবু, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আজ পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু রিপোর্টটা সম্পূর্ণ অন্যরকম বলছে।

অন্য রকম!

হ্যাঁ, cause of death—বিষ নয়।

তবে? উৎকণ্ঠিত শান্তনু দত্তরায়ের মুখের দিকে তাকায়।

গীতা দেবী সুইসাইড্ করেননি। তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

হত্যা! কি বলছেন আপনি?

তাই। গলা টিপে শ্বাসরোধ করা হয়েছে।

হত্যা করা হয়েছে তাকে? কে—কে তাকে হত্যা করল?

আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব। মনে হচ্ছে বাড়ির মধ্যেই কেউ। কারণ সে-সময় তো বাইরের কেউ ছিল না। আচ্ছা, আপনাদের ঐ চাকর শম্ভুচরণ—

না না, এ আপনি কি বলছেন! শম্ভু একপ্রকার গীতাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে—

তাহলেও পুরনো চাকরবাকরের অমন দুষ্কৃতির নজিরেরও অভাব নেই।

কিন্তু কেন—কেন সে গীতাকে হত্যা করবে?

সে কথা এই মুহূর্তে আমি বলতে পারব না আরও ইনভেসটিগেশন না করে। শম্ভুকে একবার আমি থানায় নিয়ে যেতে চাই। তাকে একবার ডাকুন।

কিন্তু আশ্চর্য!

শম্ভুকে ডেকে সাড়া পাওয়া গেল না। এবং খোঁজ করে জানা গেল, গত রাত থেকেই নাকি শম্ভু নেই।

কোথায় গেল শম্ভু ?

মানদা বললে, তা তো জানি না।

আমাকে এ কথা এতক্ষণ জানাওনি কেন ? শান্তনু প্রশ্ন করে।

ভেবেছিলাম আপনিই হয়ত তাকে কোন কাজে কোথাও পাঠিয়েছেন দাদাবাবু। মানদা বলে।

॥ তিন ॥

শম্ভুচরণ যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে। দুদিন ধরে সারা কলকাতা শহর তোলপাড় করেও তার কোন সন্ধান করা গেল না। পুলিস হন্যে হয়ে যেন শম্ভুচরণকে সর্বত্র খুজে বেড়াচ্ছে। তার গ্রামের বাড়িতেও ধাওয়া করেছিল পুলিস, কিন্তু সেখানেও তার কোন সন্ধান পায়নি।

পুলিসের এক প্রকার ধারণাই হয়ে গিয়েছে, ঐ শম্ভুচরণই দোষী। সে-ই গীতাকে হত্যা করেছে।

শান্তনু কিন্তু এখনও বলছে, শম্ভু গীতাকে হত্যা করতেই পারে না, কিছুতেই সে বিশ্বাস করতে পারে না। তবে শম্ভুচরণ গীতাকে না হত্যা করলেও কেউ-না-কেউ হত্যা করেছে তাকে ঠিকই—কিন্তু সে কে ? কে হত্যা করতে পারে গীতাকে ? আর কেনই বা হত্যা করল ? গীতার মৃত্যু হয়েছে, কথাটা যেন এখনও কিছুতেই ভাবতে পারছে না শান্তনু।

হঠাৎ মনে পড়ে শান্তনুর একজনের কথা। প্রেসিডেন্সিতে একসময় বছর-দুই পড়েছিল। তারপর দুজন দুদিকে চলে যায়। তাহলেও মধ্যে মধ্যে দেখা হয়েছে।

তার কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আর দেরি করে না

শান্তনু, সেইদিনই সন্ধ্যার দিকে সোজা তার বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়।

বাইরের ঘরেই ছিল সে, একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিল। শান্তনুকে দেখে বলে, এস শান্তনু, বস।

শান্তনু বসল। একটু পরে ভদ্রলোককে বিদায় করে দিয়ে সে তাকাল শান্তনুর মুখের দিকে। বললে, অনেক দিন পরে দেখা তোমার সঙ্গে। কিন্তু কি ব্যাপার? মুখ দেখে যেন মনে হচ্ছে, you are very much worried—খুব চিন্তিত!

কিরীটী!

শান্তনুর ডাকে কিরীটী ওর মুখের দিকে তাকাল, বস, একটু চায়ের কথা বলে আসি।

ওসব এখন থাক ভাই। তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই আমার এক বোন ছিল—ঐ একটি মাত্রই বোন গীতা, তাকে গলা টিপে গত শনিবার রাত্রে কে যেন হত্যা করেছে।

হত্যা করেছে!

হ্যাঁ। প্রথমে সবার ধারণা হয় ব্যাপারটা বুঝি সুইসাইড্, কিন্তু পরে পোস্টমর্টেম রিপোর্টে বলছে, না, গলা টিপে শ্বাসরোধ করে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

কোথায়?

তার শোবার ঘরে।

কিরীটীর অনুরোধে তখন শান্তনু সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া বলে যায়, তারপর বলে, কিন্তু কে—কে হত্যা করতে পারে গীতাকে? কেনই বা হত্যা করল? পুলিসের ধারণা বাড়িরই কেউ—আর ঐ শম্ভুচরণই, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না।

কিরীটী জবাবে কিছু বলে না। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর একসময় বলে, ঐ যে তিনটি ছেলের নাম করলে, গীতার

সহকর্মী ও বিশেষ পরিচিত—কুণাল, প্রতুল ও সুভাষ—ওরা কি বলছে ?

ওরা তো রীতিমত shocked।

ওদের তো তুমি সকলকেই চেন ?

হ্যাঁ, খুব চিনি।

কি রকম মনে হয় ওদের ?

কালচার্ড, সভ্য—আর যতদূর মনে হয় ওরা গীতাকে সত্যিই ভালবাসত।

They are all bachelors ? কেউই বিয়ে করেনি ?

না।

কে কি করে ?

সুভাষের অবস্থাই ওদের মধ্যে সব চাইতে ভাল। কোন রকম চাকরিবাকরি করে না, পার্টি নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত। লেখাপড়া বোধ হয়—বি-এ পর্যন্ত পড়েছিল। কুণাল প্রফেসারী করে, তাছাড়া একজন কবি। অবস্থা মোটামুটি। প্রতুল একটা সংবাদপত্রের অ্যাসিস্টেন্ট-এডিটর। ওদের পার্টির একজন প্রচণ্ড উৎসাহী পাণ্ডা। সুভাষকে মনে হয়েছে আমার একটা অংহকারী ও উদ্ধত প্রকৃতির, কুণাল খুব শান্ত ও নিরীহ, প্রতুল ভীষণ বদরাগী ও অস্থির প্রকৃতির ; একসময় কলেজ-জীবনে নামকরা একজন অ্যাথলেট ছিল।

কাল সন্ধ্যার দিকে ওদের একটিবার তোমার বাড়িতে ডাকতে পার ? ওদের সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলতে চাই আমি।

বেশ তো।

পরের দিন সন্ধ্যায়—নিরালায়। এক এক করে প্রশ্ন করছিল ওদের কিরীটী।

প্রথমেই প্রতুল। দু-চারটে কথাবার্তার পর কিরীটী প্রতুলের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে, এবারে একটা কথার শুধু স্পষ্ট জবাব চাই প্রতুলবাবু, আপনি গীতাকে ভালবাসতেন এবং গীতাও আপনাকে ভালবাসত জানি। আপনাদের পরস্পরের ঐ ভালবাসার মধ্যে কি কোন কারণে চিড় ধরেছিল?

চিড়!

হ্যাঁ, কারণ ঐ ধরনের ভালবাসা যেমন selfish তেমনি blind—অন্ধ। কখনও কখনও তাই সামান্যতম কারণেও, সামান্য সন্দেহে—

না, সেরকম কিছু ঘটেনি। কারণ সামনেই জানুয়ারীতেই আমরা বিয়ে করব স্থির ছিল—

এ কথাটা কুণাল ও সুভাষবাবু জানতেন?

স্পষ্ট করে আমরা না বললেও, ওরা বোধ হয় সন্দেহ করেছিল।

কিসে বুঝলেন?

মধ্যে মধ্যে ওদের কথাবার্তায় ইদানীং মনে হত।

আপনারা তিনজন সহকর্মী ও বন্ধু জানি, দীর্ঘদিনের পরিচিতও—ওদের দুজনার মধ্যে কাকে আপনি বেশী পছন্দ করেন?

সুভাষ অত্যন্ত selfish—আত্মসর্বস্ব, আর একটু অহংকারীও। I like কুণাল more than সুভাষ।

আচ্ছা সে-রাত্রে কখন—ঠিক মানে কত রাত্রে আপনারা বের হয়ে যান এই নিরালা থেকে মনে আছে?

হুঁ, মনে আছে—রাত বারোটা বেজে পনের মিনিট।

সে-সময় গীতাকে আপনার কি রকম মনে হয়েছিল?

অত্যন্ত স্বাভাবিক, হাসিখুশি।

আর একটা কথা প্রতুলবাবু, গীতার মৃত্যুর ব্যাপারে আপনার ঐ দুই বন্ধুর মধ্যে কাউকে আপনি সন্দেহ করেন?

না, না। এ আপনি কি বলছেন মিঃ রায়!

প্রেম মানুষকে যেমন দুর্বল অসহায় ভীরু করতে পারে, তেমনি অন্ধ অবিবেচক হিংস্রও করে তুলতে পারে। কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করে বলি, এই প্রেম—যার অন্য সংজ্ঞা পুরুষ বা নারীর একের প্রতি অন্যের আকর্ষণ, যেটাকে মানুষের আদিম রিপুও বলতে পারেন।....আচ্ছা ঠিক আছে, আপাততঃ আর আপনার সঙ্গে আমার কোন কথা নেই। আপনি যেতে পারেন।

।। চার ।।

বসুন কুণালবাবু।

কিরীটীর আহ্বানে কুণাল সামনাসামনি সোফাটার উপর বসল। মামুলী কয়েকটা প্রশ্নের পর তাকেও কিরীটী ঐ একই প্রশ্ন করে।

চিড় ধরেছিল কিনা জানি না, কুণাল বলে, তবে প্রতুলের সঙ্গে যে আড়ালে-আবডালে একটা ব্যাপার ওর চলেছে আমি বুঝতে পেরেছিলাম সেটা। আর তাই নিয়ে দুজনের মধ্যে আমাদের কথা-কাটাকাটিও হয়ে গিয়েছিল কিছুদিন আগে। আমি সবটাই গীতাকে বলেছিলাম। তার মনের মধ্যে যদি অন্য কিছু থাকে সে আমাকে যেন স্পষ্টই বলে দেয়। আমি একটি বোকা বনতে চাই না।

কি বলেছিল তাতে গীতা?

বলেছিল, আমার পছন্দমত কাউকে বিয়ে করারও কি আমার অধিকার নেই তুমি বলতে চাও কুণাল!

কেন থাকবে না? কিন্তু বিট্রে করবার নিশ্চয়ই তোমার কোন যুক্তি নেই।

উত্তরে কি জবাব দিয়েছিল গীতা?

মৃদু হেসেছিল কেবল।

কুণালবাবু, আর একটা কথা, গীতার মৃত্যুর ব্যাপারে আপনার ঐ দুই বন্ধুকে কোন রকম সন্দেহ করেন ?

কুণাল চুপ করে থাকে।

কি, জবাব দিচ্ছেন না যে !

জানি না। তবে প্রতুল—ওকে আমি বিশ্বাস করি না, রাগলে ওর অসাধ্য কিছু নেই।

সর্বশেষে এল সুভাষ।

কিরীটীর সেই একই প্রশ্ন।

প্রথম প্রশ্নের জবাবে বলে, রাত ঠিক বারোটা পনের।

আপনার গাড়ি করেই তো সকলকে আপনি পৌঁছে দেন ?

হ্যাঁ।

রাত কটায় আপনি বাড়ি ফিরে যান ?

তা একটা হবে।

কি রকম speed-এ আপনি গাড়ি চালান ?

বেশ একটু speed-এ চালাই।

আচ্ছা সুভাষবাবু, আপনি কি জানতেন যে আপনার বন্ধু প্রতুলবাবুর সঙ্গে গীতা দেবীর বিয়ের ব্যাপারটা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল ?

জানব না কেন ?

জানতেন ! তারাই বুঝি আপনাকে জানিয়েছিল—গীতা ও প্রতুলবাবু ?

হ্যাঁ—না—they were coward ; সোজা কথা স্পষ্ট করে যারা বলতে পারে না, বলবার courage রাখে না—তাদের আমি ঘৃণা করি। সুভাষের কণ্ঠস্বরে যেন একটা বিরক্তি, ঘৃণা ঝরে

—অথচ ব্যাপারটা নিয়ে লুকোচুরি করবার কিছুই ছিল না, আর জানালেও যে আমরা কেউ ভেঙ্গে পড়তাম হতাশায় তাও নয়।

আপনি কি করে প্রথম কবে জানতে পারলেন ব্যাপারটা? কিরীটী এবারে প্রশ্ন করে।

কি করে জানলাম সেটা বলব না, তবে মাসখানেক আগে জানতে পারি প্রথম।

আপনি যে জানতে পেরেছেন সেটা ওদের জানিয়েছিলেন?

না।

কেন?

ও সব নোংরা ব্যাপার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করাটা আমার রুচি ও শিক্ষায় বেধেছিল বলে।

নোংরা ব্যাপার!

তাছাড়া কি? যারা ভালবাসার নাম করে শেষ পর্যন্ত পরস্পরের দেহ নিয়ে টানাটানি করে তাদের সবটাই নোংরামি। যাদের রুচি আছে, শিক্ষা আছে—তাদের অতখানি বিকৃতি কখনও হয় না।

কিরীটী একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে, মনে হচ্ছে আপনি গীতাকে ভালবাসতেন—if I am not wrong!

ক্ষেপেছেন? ভালবাসতে যাব আমি ঐ মনোবৃত্তির একটা তুচ্ছ মেয়েছেলেকে? গীতা জানত না যে তাকে আমি কতখানি ঘৃণা করতাম, তার চরিত্রের ঐ দুর্বলতা আর হ্যাংলামির জন্য!

তাহলেও বুঝতে পারছি, কখনও সে কথা গীতাকে আপনি জানতে দেননি—নচেৎ সবকিছু জানবার পরও আপনি তাঁর সঙ্গে মিশতেন না বা হেসে কথা বলতেন না।

বরং বলুন অতখানি নীচে কখনও আমি নামতে পারিনি!

আপনি বোধ হয় শুনেছেন গীতার মৃত্যুর কারণ বিষ নয়?

বিষ নয়!

না, কেউ তাকে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে সে-রাত্রে।

না, না—তা কেন হবে—

তাই। ময়নাতদন্তেও তাই বলছে। আচ্ছা কাউকে আপনি সন্দেহ করেন!

না।

অতঃপর সেদিনকার মত কিরীটী সকলকে বিদায় দিল।

দিন-দুই পরে।

সন্ধ্যারাত্রি তখন। কিরীটী হঠাৎ গিয়ে হাজির হয় সুভাষের গৃহে। সুভাস গৃহে ছিল না।

সীতারাম বললে, দাদাবাবু তো বাড়িতে নেই!

কোথায় গিয়েছেন জান?

না।

কখন ফিরবেন, তাও জান না?

না।

তোমার নাম কি?

আজ্ঞে সীতারাম।

কতদিন এ বাড়িতে আছ?

তা দশ-বারো বছর হবে।

তুমি শুনেছ বোধ হয় গীতা দিদিমণি মারা গিয়েছেন?

শুনেছি বৈকি বাবু। আহা দিদিমণি বড় ভাল ছিল। হাসি ছাড়া কখনও দেখিনি।

এখানে আসত না?

হ্যাঁ প্রায়ই আসত।

তোমার দাদাবাবুর সঙ্গে খুব ভাব ছিল, তাই না ?

আজ্ঞে। আমি তো ভেবেছিলাম দাদাবাবু গীতা দিদিমণিকেই বিয়ে করবে।

আচ্ছা সেদিন রাত্রে কখন দাদাবাবু তোমার ফিরেছিল মনে আছে ?

রাত তখন একটা হবে। না—ঠিক তা নয় বোধ হয়, রাত প্রায় দেড়টা হবে!

একবার বলছ রাত একটা, আবার বলছ রাত দেড়টা—

হ্যাঁ বাবু, ঘড়িটা আধ ঘণ্টা শ্লো হয়ে গিয়েছিল মনে পড়ছে আমার—

ঘড়িটা আধঘণ্টা শ্লো হয়ে গিয়েছিল কি রকম ?

হ্যাঁ, পরের দিন দেখি—দাদাবাবু গীতা দিদিমণির বাড়ি থেকে ফিরে এসে, ঘড়িটা ঠিক করছে। আধঘণ্টা এগিয়ে দিলে দেখলাম।

কোন্ ঘড়িটা ?

সীতারাম ঘড়িটা দেখিয়ে বলে, ঐ ঘড়িটা।

'ওটা শ্লো-ফাস্ট থাকে নাকি ?

কখনও না। একেবারে ঠিক ঠিক টাইম দেয়। কখনও আগে-পিছে হতে গত দশ বছরে দেখিনি।

আচ্ছা সীতারাম, আমি চলি।

কিন্তু আপনি কোথা থেকে আসছেন, কি নাম আপনার—বললেন না তো ?

আমি আবার আসব। কথাটা বলে বের হয়ে এল কিরীটী।

সেখান থেকে বের হয়ে কিরীটী সোজা গেল নিরালায়।

শান্তনু গৃহেই ছিল।

শান্তনু!

বল ?

তুমি সেদিন বলেছিলে না, তোমার মাসী গীতার পাশের ঘরেই শোন!

হ্যাঁ, কেন বল তো?

তাঁকে একটিবার ডাকবে? তাঁর সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে!

শান্তনু তখনি গিয়ে সৌদামিনীকে ডেকে নিয়ে এল।

বসুন মাসীমা। কয়েকটা কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করব।

কি বাবা?

রাত্রে আপনার ঘুম হয় কেমন?

ঘুম কি আর চোখে আছে—

সে-রাত্রে তো আবার বাতের ব্যাথাটা আপনার বেড়েছিল, তাই না?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, সাড়ে বারোটা পৌনে একটার সময় কোনরকম শব্দ বা চেঁচামেচি শুনেছিলেন পাশের ঘরে?

চেঁচামেচি নয়, তবে—

বলুন—থামলেন কেন?

দেখ বাবা—সেদিন আমি দারোগাবাবুকে বলিনি, তবে আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে, সে-রাত্রে গীতা যেন কার সঙ্গে কথা বলছিল—

আর কিছু শোনেননি?

না।

ঠিক আছে, আপনি যেতে পারেন।

মাসী চলে যাবার পর কিরীটী বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলে, ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে শান্তনু।

কি? কিছু জানতে পেরেছ?

হ্যাঁ। বুঝতে পেরেছি কে তোমার বোনকে হত্যা করেছে।

কে ? শম্ভু ?

না। ভাল কথা, শম্ভুকে পাওয়া গেছে জান না ?

না তো! কোথায় ? কখন ?

মেদিনীপুরে এক গাঁয়ে তার আত্মীয়-বাড়িতে।

সে পালিয়েছিল কেন ?

ভয়ে।

ভয়ে!

হ্যাঁ। কিন্তু একটা কথা তুমি কি জানতে, গীতা প্রতুলকে বিয়ে করবে বলে স্থির করেছিল ?

জানতাম।

And that is the cause—

কি বলছ তুমি ?

তাই। প্রতুল সুভাষ ও কুণাল তিনজনই গীতাকে ভালবাসত —সবাই মনে মনে গীতাকে চাইছিল, কিন্তু গীতা যখন প্রতুলকে বেছে নিল জীবনে ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠল। যার ফলে শেষ পর্যন্ত তাকে ঐ নিষ্ঠুর মৃত্যুবরণ করতে হয়।

সত্যি বলছ ?

হ্যাঁ। প্রেম যেমন সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারে, তেমনি প্রচণ্ডতম নিষ্ঠুর ও হিংস্র হতে পারে। আর এক্ষেত্রেও হয়েছিল তাই—

কিন্তু কে ?

গীতার তিনবন্ধুরই মধ্যে একজন।

কে ?

কাল বলব। তুমি ওদের তিনজনকে কাল সন্ধ্যায় ডেকে পাঠাও।

পরের দিন সন্ধ্যায়।

ঘরের মধ্যে সকলেই উপস্থিত। শান্তনু, কিরীটী, দত্তরায়, সুভাষ, কুণাল ও প্রতুল।

কিরীটী বলছিল, আপনারা নিশ্চয়ই অবাক হবেন শুনলে, গীতাকে আপনাদের তিনজনের মধ্যেই একজন খুন করেছেন!

প্রতুল বলে, কি অবোল-তাবোল বকছেন মশাই?

আবোল-তাবোল নয়, নিষ্ঠুর সত্য—

সুভাষ বলে, কিন্তু আমরা তো কেউ সে-রাত্রে ছিলামই না। একসঙ্গে তিনজন বের হয়ে যাই।

গিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু আবার সে-রাত্রে ফিরে আসা তো অসম্ভব কিছু ছিল না!

তার মানে? সুভাষ বলে।

তার মানে, ভেবে দেখুন কে এবং আপনাদের তিনজনের মধ্যে কার পক্ষে সে-রাত্রে আবার ফিরে আসা সম্ভবপর ছিল!

কার?

কেন—আপনি সুভাষবাবু! আপনার গাড়ি ছিল, আপনি বন্ধুদের পৌঁছে দিয়ে এখানে সোজা আবার চলে আসতে অনায়াসেই পারতেন না! আর তাই হয়েছিল, আপনি সে রাত্রে আবার ফিরে আসেন নিরালায়।

আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি!

মাথা যে আমার খারাপ হয় নি, আপনার চাইতে সে-কথা আর কেউ ভাল জানে না সুভাষবাবু। আর আপনি যে ফিরে এসেছিলেন তার প্রমাণও আছে।

প্রমাণ! প্রশ্নটা প্রতুল করে এবার।

হ্যাঁ। নং, সে-রাত্রে গীতার ঘরে কথাবার্তা শুনেছিলেন মাসীমা, আপনারা তো কেউ সে-রাত্রে উপরে গীতার ঘরে আসেননি, নীচ থেকেই বিদায় নিয়েছিলেন। শান্তনুও বাড়ি ছিল না। তবে সে কে?

২নং, সে-রাত্রে গীতা উপরে আসবার পরও শম্ভুচরণ সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনেছিল। সে কার পায়ের শব্দ? ৩নং, আপনার বাড়ির ঘড়ির কাঁটাটা আধ ঘণ্টা পিছিয়ে দিয়েছিলেন। সময়ের ব্যবধানটা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। এর পরও অস্বীকার করতে চান সে-রাত্রে আবার আপনি আসেননি?

হঠাৎ সুভাষ হো হো করে হেসে ওঠে। চমৎকার! যদি ধরুন আমিই—প্রমাণ কি তার?

হ্যাঁ। ৪নং, এই রুমালটা আপনার—কোণে আপনার নামের মনোগ্রাম করা আছে, দেখুন।

সুভাষ একেবারে বোবা। যেন পাথর।

এটা কোথায় পাওয়া গেছে জানেন? গীতার ঘরে। এটাই শম্ভুচরণ দিয়েছে। আপনাকে—

শম্ভু!

হ্যাঁ, তাকে আপনি ভয় দেখিয়ে কলকাতা-ছাড়া করবার চেষ্টা করেছিলেন, কারণ আপনার সন্দেহ হয়েছিল সে কিছু জানে। বেচারী ভয় পেয়ে পালিয়ে না গেলে হয়ত শেষ পর্যন্ত এই মোক্ষম প্রমাণটা তার কাছ থেকে পেতাম না—আপনি হয়ত তাকেও হত্যা করতেন। শুনুন সুভাষবাবু, সেদিন আপনার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে যে প্রচণ্ড ঘৃণা ও আক্রোশ আপনার কথায়বার্তায় প্রকাশ পেয়েছিল গীতা সম্পর্কে সেটাই আমাকে সর্বপ্রথম অনুসরণের আলো দেখায়।

সুভাষ নির্বাক।

৩

বছর দশ-বারো আগেকার কথা।

তখন ভোর বেলা সংবাদপত্রের পাতা খুললেই প্রথম পৃষ্ঠাতে শহরের এখানে-ওখানে নিত্য আট দশটা খুনখারাপির কথা দেখা যেত না।

এ অশান্তি আর অস্থিরতা ছিল না এ শহরের জনজীবনে। এত আতঙ্ক আর খুনোখুনি রক্তপাতও ছিল না।

সেই সময়ই দু'মাসের মধ্যে পর পর তিনটি খুনের সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল। নিহত ব্যক্তিরা শহরের গণ্যমান্য কোন বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি না হলেও, প্রত্যেকেই তারা যাকে বলে ধনী এবং নামী জুয়েলার্স। এবং জুয়েলারীর ব্যবসা ছাড়াও কলকাতা শহরে তাদের গাড়ি বাড়ী ও প্রচুর ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স প্রত্যেকেরই ছিল। এবং তাদের হত্যার ব্যাপারে বিশেষ যে ব্যাপারটা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, সেটা হচ্ছে প্রত্যেকেরই গলায় একটা নীল রেশমী রুমাল জড়িয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে।

পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগ নানা ভাবে অনুসন্ধান করেও তিন-তিনটে নিষ্ঠুর হত্যা-ব্যাপারে কোন হদিস করতে পারেনি।

শীতের এক সকালে কিরীটী তার বসবার ঘরে বসে গায়ে একটা শাল জড়িয়ে আরাম করে চা পান করছে, এমন সময় জংলী ওইদিনকার সংবাদপত্রটা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল।

কৃষ্ণা পাশেই বসেছিল। সেই-ই প্রথমে জংলীর হাত থেকে সংবাদপত্রটা নিয়ে প্রথম পৃষ্ঠাটা খুলে তার ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে বলে উঠল, দেখেছ, আবার সেই নীল রুমাল! আবার একজন জুয়েলার—

কিরীটী মুখ তুলে কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে বললে, মানে ?

আবার আর একজন জুয়েলারকে গলায় নীল রুমাল পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। কৃষ্ণা বললে।

তাই নাকি ! কিরীটীর কণ্ঠে যেন একটা ব্যগ্রতার সুর।

হ্যাঁ। ভদ্রলোকের নাম শশধর সরকার। বৌবাজারে মস্ত বড় জুয়েলারী শপ 'সরকার জুয়েলার্স'-এর প্রোপ্রাইটার ছিলেন।

দেখি ! কিরীটী হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিল।

প্রথম পৃষ্ঠাতেই সংবাদটা প্রকাশিত হয়েছে।

আবার সেই নীল রুমাল ! আবার একজন জুয়েলার। এই নিয়ে হল তিনজন।

এবারে নিহত হয়েছেন বিখ্যাত জুয়েলারী শপ 'সরকার জুয়েলার্স'-এর প্রোপ্রাইটার শশধর সরকার। ভদ্রলোকের বয়স বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ হবে। তাঁর দোকানের মধ্যেই তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। পুলিশ-তদন্তে প্রকাশ, শনিবার বেলা আড়াইটে নাগাদ দোকান বন্ধ হয়ে যায়। দোকান বন্ধ করে সকলের সঙ্গে শশধর সরকার বের হয়ে যান। রাত্রি আটটা পর্যন্ত তিনি বালিগঞ্জে যতীন দাশ রোডে তাঁর বাড়িতেই ছিলেন। রাত আটটা নাগাদ একটা ফোন-কল পেয়ে তিনি বের হয়ে যান। বাড়ির কেউ বলতে পারেনি কোথা থেকে ফোন-কলটা এসেছিল এবং কে করেছিল বা কোথায় তিনি গিয়েছিলেন। স্ত্রীকে কেবল বেরুবার সময় বলে যান একটা বিশেষ কাজে বেরুচ্ছেন, ঘন্টা দেড়েকের মধ্যেই ফিরে আসবেন। কিন্তু রাত বারোটা বেজে গেল—যখন তিনি ফিরলেন না, তখন শশধর সরকারের স্ত্রী ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। চারদিকে জানাশোনা জায়গায় ফোন করতে থাকেন, কিন্তু কেউ তাঁর কোন সংবাদ দিতে পারে না। একসময় রাত শেষ হয়ে গেল, কিন্তু শশধর সরকার ফিরলেন না। পরের দিন সকাল দশটা নাগাদ দোকান থেকে ফোন এল।

দোকানের একজন কর্মচারী—বিনয়ভূষণ ফোন করেছে। রবিবার দোকান বন্ধ। সে বাসায়ই ছিল। বৌবাজার অঞ্চলেই তার বাসা। একটি ছোকরা এসে তার বাসায় তাকে জানায়। ছেলেটি ওই পাড়ায়ই, বিনয়ভূষণকে চিনত।

বিনয়বাবু, শীগগিরই একবার দোকানে যান!

দোকানে? আজ তো রবিবার, দোকান বন্ধ?

তা তো জানি। ছোকরাটি বলে, দেখলাম, আপনাদের দোকানের কোলাপসিবল গেটটা খোলা।

খোলা! সে কি!

হ্যাঁ। ব্যাপার কি দেখবার জন্য ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখি. দোকানের ভেতরে সব আলো জ্বলছে, আর—

কি?

কে একটা লোক মেঝেতে পড়ে আছে। আমি ছুটতে ছুটতে এসেছি আপনাকে খবরটা দিতে।

বলাই বাহুল্য, অতঃপর বিনয়ভূষণ উঠি-কি-পাড় করে সঙ্গে সঙ্গে দোকানে ছুটে যায়, এবং দেখে ছোকরাটির সংবাদ সত্য। শুধু তাই নয়,মৃত ব্যাক্তি আর কেউ নয়—তাদেরই মালিক শশধর সরকার। তার গলায় একটা নীল রুমাল বাঁধা। শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। চোখ দুটো যেন ঠেলে বের হয়ে আসছে। প্রথমটায় ওই বীভৎস দৃশ্য দেখে বিনয় ভূষণ আতঙ্কে যেন বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে সে-ই পুলিশে ফোন করে সংবাদটা দেয়।

পুলিশ আসে। ঘরের মধ্যে শো-কেসগুলো যেমন ছিল, তেমনিই আছে। প্রত্যেক শো-কেসে নানা ধরনের অলঙ্কার সাজানো যেমন ছিল, ঠিক তেমনই আছে। কোনটার তালা বা চাবি ভাঙা হয়নি। এমন কি দোকানের চাবির গোছাটা শশধর সরকারের জামার পকেটেই পাওয়া গেছে। দোকানের যে দারোয়ান হনুমানপ্রসাদ

দোকানের প্রহরায় থাকত রাত্রে, তাকে দোকানের পেছন দিককার একটা ঘরে খাটিয়ার উপর নিদ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। বেলা দশটার সময়ও সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। অনেক কষ্টে ঠেলেঠুলে তার ঘুম ভাঙানো হয়, কিন্তু সে কিছুই জানে না। সন্ধ্যার দিকে তার এক দেশওয়ালী পরিচিত ব্যক্তি এসেছিল, দুজনে মিলে লোটা-দুই সিদ্ধির শরবৎ খেয়েছিল। তারপর তার সেই লোকটা চলে যায়, আর হনুপ্রসাদও খাটিয়ায় শুয়ে নিদ যায়। সে কিছু জানে না—রামজীর কসম। দোকানের অন্যান্য কর্মচারীদের শুধিয়ে ও খাতাপত্র দেখে যতদূর জানা গেছে, দোকান থেকে কোন অলঙ্কারাদি বা সিন্দুকের টাকাকড়ি কিছুই চুরি যায়নি। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, ব্যাপারটা শুধু হত্যাই—স্রেফ হত্যার উদ্দেশ্যেই হত্যা করা হয়েছে, কোন চুরি-চামারির ব্যাপার নেই এই হত্যার সঙ্গে।

কৃষ্ণা বললে, পড়লে?

কিরীটী বললে মৃদু কণ্ঠে, হুঁ।

মনে হল কিরীটী যেন কি ভাবছে।

সত্যিই কিরীটী ভাবছিল। হঠাৎ কাগজটা রেখে কিরীটী উঠে সোজা গিয়ে ঘরের কোণে রক্ষিত ফোনের রিসিভারটা তুলে ডায়াল করতে লাগল বৌবাজার থানায়।

থানা-অফিসার বিকাশ সেন তার পরিচিত।

বিকাশ থানাতেই ছিল, সেই-ই ফোন ধরে অপর প্রান্তে। ও. সি. বৌবাজার থানা স্পিকিং—

কে, বিকাশ? আমি কিরীটী।

আরে মিঃ রায়! কি খবর? হঠাৎ?

কাগজে দেখলাম, তোমার এলাকায় কে একজন শশধর সরকার পরশু রাত্রে খুন হয়েছে!

হ্যাঁ, আবার সেই নীল রুমাল মিস্টার রায়—

জানি। তা কোন-কিছুর কিনারা করতে পারলে বা হদিস করতে পারলে?

না। তবে—

কি?

তার গলায় পেঁচানো ছিল যে নীল রুমালটা, যার সাহায্যে বেচারীকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে, সেই রুমালটা পরীক্ষা করতে করতে একটা জিনিস নজরে পড়েছে জানেন মিস্টার রায়—

কি বল তো?

ছোট্ট করে লাল সুতোয় লেখা একটা সাঙ্কেতিক ইংরাজি অক্ষর '3' অর্থাৎ তিন।

আমিও ঠিক ওই কথাটাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম বিকাশ। যাক, নিশ্চিন্ত হলাম।

মানে?

টেলিফোনে সব কথা হতে পারে না। তোমার হাতে যদি সময় থাকে চলে এস একবার আমার বাড়িতে।

যাবার কথা যখন আপনি বলছেন, তখন হাতে হাজার কাজ এবং সময় না থাকলেও যেতে হবে। আমি এখুনি আসছি। বলে বিকাশ টেলিফোনটা রেখে দিল অপর প্রান্তে।

কিরীটীও রিসিভারটা নামিয়ে রেখে পুনরায় সোফায় এসে বসল।

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার? কাকে আসবার জন্য জরুরী তাগিদ দিলে গো ফোনে?

বৌবাজার থানার ও-সি আমাদের বিকাশ সেনকে।

আমাদের বিকাশবাবু!

হ্যাঁ। ও হয়ত এখুনি এসে পড়বে। তুমি বরং কিছু ভালমত জলখাবারের ব্যবস্থা কর কৃষ্ণা। জান তো, বিকাশ সেন কিরকম পেটুক মানুষ!

কৃষ্ণা হেসে বলে, জানি, সে ব্যবস্থা হবে'খন। কিন্তু ব্যাপারটা কি বল তো? হঠাৎ এত জোর তলব কেন ভদ্রলোকটিকে?

আজকের সংবাদপত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার অ্যাডভ্যাটাইজমেণ্ট—বিজ্ঞাপনের পাতাটা দেখ। একটা বিজ্ঞাপন আছে নিশ্চয়ই, যদি আমার অনুমান মিথ্যা না হয় তো।

বিজ্ঞাপন! কিসের বিজ্ঞাপন? কৃষ্ণা যেন একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই শুধোয়।

বেদ পাঠের। কিরীটী মৃদু হেসে বললে।

মানে?

আহা, দেখই না আগে বিজ্ঞাপনটা আছে কিনা!

কৃষ্ণা বিনা বাক্যব্যয়ে অতঃপর সংবাদপত্রটা তুলে নিয়ে দ্বিতীয় পৃষ্ঠাটা খুলে চোখ বুলোতে শুরু করে।—এ তো দেখছি বিবাহ, হারানো প্রাপ্তি ও নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপনেই পাতা ভর্তি! দেখতে দেখতে বলে কৃষ্ণা।

তোমার চোখে দেখছি চালসে পড়েছে কৃষ্ণা! ডাঃ জিতেন চক্রবর্তীর কাছে একদিন তোমাকে না নিয়ে গেলে চলছে না। কাগজটা দাও, দেখাচ্ছি। আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তো—নিশ্চয়ই বিজ্ঞাপনটা আছে আজকের কাগজেও।

কৃষ্ণার হাত থেকে কিরীটী হাত বাড়িয়ে কাগজটা টেনে নিল।

কয়েক মুহূর্ত চোখ বুলিয়ে কিরীটী বলে উঠল, বলছিলাম না—নিশ্চয়ই বিজ্ঞাপনটা বের হয়েছে, এই দেখ—

দেখি! বলে কৃষ্ণা কাগজটার ওপরে ঝুঁকে পড়ল।

পৃষ্ঠার মাঝামাঝি কলমে সত্যিই একটা বক্স করা বিচিত্র বিজ্ঞাপনের প্রতি কিরীটী অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে, পড়।

কৃষ্ণা ঝুঁকে পড়ল।

একটা বক্স-করা বিজ্ঞাপন পাইকা টাইপে ছাপা হয়েছে ছোট কবিতার মত।

এ যে দেখছি একটা কবিতা!

আহা, পড়ই না।

একে চন্দ্র অস্তমিত
দুইয়ে পক্ষ কর্তিত
তিনে নেত্র উৎপাটিত
চারে বেদ পঠন-পাঠন
যা হলেই সমাধান।
নতুন কিতাবে নতুন ছড়া
শীঘ্রই প্রকাশ হচ্ছে—

কৃষ্ণা বার-দুই পড়ল বিচিত্র বিজ্ঞাপনটা। তারপর বললে নতুন বইয়ের বিজ্ঞাপন মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ। কিরীটী মৃদু হেসে বলে, নতুন এক কিতাবই বটে! রক্তের হরফে লেখা হচ্ছে। শেষ পরিচ্ছেদটি কেবল এখন বাকি। সেটি লেখা হলেই অর্থাৎ সমাপ্ত হলেই পুস্তকটি শেষ।

কৃষ্ণা বুঝতে পারে বিজ্ঞাপনের মর্মার্থটা সে ঠিক উদ্ধার করতে পারেনি। তাই বলে, মনে হচ্ছে ওই বিজ্ঞাপনের মধ্যে কোন রহস্যের গন্ধ তুমি পেয়েছ!

রহস্য বলে রহস্য—মারাত্মক রহস্য! তবে বেচারী এখনও বুঝতে পারেনি—

কি?

অতি দম্ভে যেমন লঙ্কাধিপতি হত হয়েছিল, তেমনি তারও মৃত্যুবাণ তার অতি দম্ভের ছিদ্রপথে বের হয়ে এসেছে। তারপর একটু থেমে আবার বলে, কিছুদিন ধরেই ওই বিজ্ঞাপনটা বেরোচ্ছিল,

তবে শেষ দুটি লাইন আজই যোগ করা হয়েছে এবং সমাপ্তির রেখা টানার ইঙ্গিতটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

কার কথা বলছ?

মেঘের আড়ালে থেকে যিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই মেঘনাদের কথা?

ঠিক আছে, তুমি হেঁয়ালিই গাও, আমি চললাম। কৃষ্ণা রাগত ভাবে উঠে দাঁড়ায়।

আরে, বসো বসো, চটছ কেন?

না, যাই—বিকাশবাবুর খাবারের ব্যবস্থা করি গে।

সে হবে'খন। বসো না।

কৃষ্ণা আবার সোফায় বসে পড়ে।

কিরীটী বলে, সংবাদপত্রে তোমার নজর পড়েছে কিনা জানি না, গত দু'মাসে আরও দুজন জুয়েলার এই শহরে খুন হয়েছে—

সে তো হচ্ছেই কত।

তা হচ্ছে, তবে ওই পূর্বের দুটি খুন ও গতকালের খুনের মধ্যে মধ্যে দুটো বিশেষত্ব আছে এবং বিশেষত্ব একটা অঙ্কের মত—

এক নম্বর হচ্ছে, যে দুজন গত দু'মাসে নিহত হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই ধনী ব্যক্তি শহরের মধ্যে এবং প্রত্যেকেই ব্যবসায়ী; শুধু ব্যবসায়ীই নয়, সোনা-রূপার ব্যবসায়ী, অর্থাৎ জুয়েলার্স ছিল। দু নম্বর, একটু থেমে মৃদু হেসে বলে, দু নম্বর—বল তো কি? স্মিত হাস্যে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল কিরীটী।

প্রত্যেককেই গলায় একটি করে নীল রুমাল পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে, তাই তো?

চমৎকার! আর কিছু? কিরীটী সহাস্যে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে তখনও।

আর!

হ্যাঁ আর—কিরীটীর কথা শেষ হল না, বাইরে গাড়ি থামার শব্দ শোনা গেল ওই সময়। কিরীটী বললে, ওই বোধ হয় আমাদের সেন সাহেব এল!

বাইরের কলিংবেলও বেজে উঠল ওই সঙ্গে। শোনা গেল তার শব্দ।

জংলী! কিরীটী ডাকে।

বলুন। জংলী সাড়া দিল।

দরজাটা খুলে দাও, বোধ হয় বিকাশবাবু এলেন।

॥ দুই ॥

যাই, চা-জলখাবার নিয়ে আসি।

কৃষ্ণা সোফা ছেড়ে উঠে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটীর অনুমান মিথ্যা নয়, একটু পরেই সিঁড়িতে একটা ভারি জুতোর মচমচ শব্দ শোনা গেল।

মোটা মানুষ বিকাশ সেন, বৌবাজার থানার ও-সি—সিঁড়ি ভাঙার পরিশ্রমে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে এসে ঢুকল।

এস বিকাশ!

বিকাশ ধপ করে একটা সোফার উপরে বসতে বসতে বললে, বাপস্! বলুন এবারে রায় সাহেব, উর্ধ্বশ্বাসে একেবারে ছুটে আসছি জীপ নিয়ে!

কিরীটী হাসল।

হাসছেন আপনি! আর এদিকে—

দেহের ওজনটা একটু কমাতে পার না? তাহলে আর হাঁপাতে হয় না?

আপনিও ওই কথা বলবেন রায় সাহেব! ঘরে-বাইরে যদি ওই একই কথা শুনতে হয়—

কেন হে, ঘরে আবার তাগিদ দিচ্ছে কে?

কে আবার! সখেদে বললে বিকাশ, তাগিদ দেবার যার ক্ষমতা বা অধিকার আছে!

বল কি, ভদ্রমহিলাও তোমার পেছনে লেগেছেন!

অথচ জানেন, গত আট মাসে আমার বিশ সের ওয়েট কমে গেছে! এভাবে ওয়েট কমতে থাকলে—

তাই নাকি? তা আট মাস পূর্বে কত ছিল—কত?

আড়াই মণও নয়—ছ'সের কম।

কিরীটী গম্ভীর হবার চেষ্টা করে কোনমতে হাসি চেপে তুলে

তাহলে তো সত্যিই যথেষ্ট কমে গেছে। কিছু

বলুন তাহলে—আরও কমলে হাঁপ ধরবে না? ব্যাঙাচিতে— হয়ে

নির্ঘাত পরিণত হবে! কোণে

আমার পরিবারটিকে একটু বুঝিয়ে বলতে পারেন, মোটা কোন হয় একটু আমি সামান্যই, তাহলেও আমার মত অ্যাকটিভ অফি- কজন আছে উপরিওয়ালারা বলুন তো!

তা কথাটা মিথ্যা নয়, মোটাসোটা হলে কি হবে বিকাশ সেন সত্যিই খুব কর্মঠ অফিসার, সরকারী মহলে যথেষ্ট নামও আছে, কিরীটীর সেটা অজানা নয়।

যাকগে ওসব কথা, বলুন এখন—হঠাৎ আসতে বললেন কেন ফোন করে?

বসো বসো, আগে চা-জলখাবার খেয়ে সুস্থ হও।

কৃষ্ণা ওই সময় এক প্লেট সন্দেশ ও চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল।

কেমন আছেন বিকাশবাবু? কৃষ্ণা প্রশ্ন করে।

নমস্কার বৌদি। ভাল, চমৎকার। কেবল চারদিকে বদমাস শয়তানগুলো জ্বালাতন করে মারছে। এই দেখুন না, গত পরশু একজন আবার নীল রুমালের ফাঁসে খতম হয়েছেন—আর হবি তো হ আমারই চৌহদ্দির মধ্যে!

ভাল কথা বিকাশ, সেই নীল রুমালটা এনেছ? কিরীটী প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, এই যে—বলতে বলতে পকেট থেকে ছোট একটা কাগজের প্যাকেট বের করল বিকাশ সেন।

কিরীটী হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নিল। নাও, শুরু কর

ণ।

কাশকে বলবার আগেই সে প্লেটটা টেনে নিয়েছিল।

বাই, কিরীটী কাগজের মোড়কটা খুলতেই একটা দামী বিলাতী

টর গন্ধের ঝাপটা ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলের নাকে এসে

ল। নীল রঙের—আকাশ-নীল-রঙের একটা বড় সাইজের

জুতো। রুমাল।

কিরীটী রুমালটা মেলে ধরে দেখতে দেখতে বললে, হুঁ, হত্যাকারী মহাশয় দেখছি রীতিমত সৌখীন ব্যক্তি! বন্দুক' রিভলবার, ছোরাছুরি নয়—একেবারে একটি সেন্টনিষিক্ত আকাশ-নীল রঙের রেশমী রুমালকেই হাতিয়ার করেছেন! জেনুইনিটি আছে বলতে হবে, কি বল বিকাশ!

একটা বড় আমসন্দেশ গালে পুরে চিবুতে চিবুতে বিকাশ বললে তা যা বলেছেন। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা, যে রেটে এ শহরে নীল রুমালের আবির্ভাব ঘটতে শুরু করেছে, শেষ পর্যন্ত না আমাদের পুলিস মহলের কণ্ঠদেশেই তা চেপে বসে।

কিরীটী হো-হো করে হেসে ওঠে বিকাশের কথায়।

বিকাশ আর একটা সন্দেশ মুখে পুরতে পুরতে বলে, অতি উপাদেয়. কোথাকার সন্দেশ বৌদি? কোন্ দোকানের?

কৃষ্ণা জবাব দেয়, দোকানের নয়।

তবে?

আমার হাতে তৈরি।

আঃ! কি ইচ্ছা করছে জানেন বৌদি?

কি? সহাস্য মুখে তাকাল কৃষ্ণা বিকাশ সেনের দিকে।

হাত দুটো আপনার সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিই।

কিরীটী আর কৃষ্ণা দুজনেই হাসে।

সন্দেশের রেকাবিটা নিঃশেষ করে চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিতে নিতে বিকাশ বললে, কি কিরীটীবাবু, রুমালটা থেকে কিছু হদিস পেলেন?

আপাততঃ যা মনে হচ্ছে রুমালের সাধারণতঃ যা সাইজ হয়ে থাকে, তার কিছু বড়। সাধারণ সিল্কের রুমাল আর এক কোণে রুমালটার সাঙ্কেতিক ইংরাজি অক্ষর '3' লেখা ছাড়া বিশেষ কোন হদিস মিলছে না, তবে—

তবে?

ওই '3' সাঙ্কেতিক অক্ষরটিকে যদি বিশেষ একটা ইঙ্গিত বলে ধরে নেওয়া যায় তো বলতে হবে—

বিকাশ সাগ্রহে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে শুধোলো, কি মিস্টার রায়?

পরশুর হত্যাটি নিয়ে যে তিনটি হত্যাকাণ্ড এই দুমাসে এই শহরে সংঘটিত হয়েছে এই ধরণেরই রুমালের সাহায্যে, সেগুলির মধ্যে অর্থাৎ সেই হত্যাকাণ্ডগুলির মধ্যে একটা বিশেষ যোগাযোগ বা যোগসূত্র হয়ত আছে।

ঠিক। আমারও তাই মনে হয়েছিল। একই ব্যক্তির দ্বারা সব কটি হত্যাকাণ্ডই সংঘটিত হয়েছে মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ।

অর্থাৎ হত্যাকারী একই ব্যক্তি এইতো বলতে চান আপনি? বিকাশ বললে।

কিরীটী মৃদুকণ্ঠে বললে, মনে হচ্ছে তো সেই রকমই।

কিন্তু একটা কথা—বিকাশ বলে।

কি বল তো? কিরীটী বিকাশের মুখের দিকে তাকাল।

ওটা যদি ইংরাজি '3' না হয়ে বাংলার '৩' হয়?

না।

কি না?

ওটা ইংরাজির '3'-ই।

কি করে স্থিরনিশ্চয় হলেন?

একটা বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে কিনা জানি না বিকাশ—

বিজ্ঞাপন!

হ্যাঁ, বিজ্ঞাপনটা কিছুদিন থেকে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে—

কি বিজ্ঞাপন বলুন তো?

কিরীটী তখন দৈনিক 'প্রত্যহে' প্রকাশিত বিজ্ঞাপন—যেটা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং যে বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কিছুক্ষণ পূর্বে তার কৃষ্ণার সঙ্গে আলোচনা চলছিল সেটা সম্পর্কে বললে।

সত্যি? দেখি বিজ্ঞাপনটা!

কিরীটী কাগজটা এগিয়ে দিল।

বিকাশ বিজ্ঞাপনটা বারকয়েক পড়লে। তারপর বললে হুঁ। বিজ্ঞাপনটা সত্যিই বিচিত্র তো। তাহলে—

ঠিক তাই বিকাশ, পর পর তিনটি হত্যাকাণ্ডই বিশেষ উদ্দেশ্য-

প্রণোদিত এবং এক বা একাধিক ব্যক্তির দ্বারা যদি সংঘটিত হয়েও থাকে, তাহলেও pre-planned—premeditated, পূর্ব-পরিকল্পিত বলেই মনে হয়—

তা তো বুঝলাম, কিন্তু—

কি বল ?

উদ্দেশ্য একটা নিশ্চয়ই আছে !

তা আছে বৈকি। হত্যাকারী কিছুটা maniac হলেও হত্যাগুলোর পেছনে তার একটা উদ্দেশ্য সুনিশ্চিত আছে। হয়ত প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধ—কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর পূর্বে তোমাকে কতকগুলো ব্যাপারের ভাল করে অনুসন্ধান নিতে হবে।

কিন্তু কি অনুসন্ধান করি বলুন তো ? ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে আর কেউ ছিল বলেই তো এখনও জানা যায়নি। পেছনের গেটে যে ব্যাটা দারোয়ান ছিল, সে ব্যাটা তো সিদ্ধির নেশায় সে রাত্রে বুঁদ হয়ে ছিল।

আচ্ছা সংবাদপত্রে যে নিউজ বের হয়েছে—সেদিন রাত আটটা নাগাদ কার কাছ থেকে একটা ফোন-কল পেয়ে শশধর সরকার বের হয়ে যান বাড়ি থেকে—

হ্যাঁ, তার স্ত্রী তো বলতে পারলেন না, ফোন-কলটা কোথা থেকে এসেছিল। কেবল বললেন, তাঁর স্বামী নাকি তাকে বলেছিলেন ফোন-কলটা জরুরী।

জরুরী তো বটেই—একেবারে মৃত্যু-পরোয়ানা। তাই বলছিলাম, সেটার কোন ট্রেস করা যায় কিনা দেখ।

কেমন করে সম্ভব তা ? অটোমেটিক ফোন—

তবু দেখ, চেষ্টা করলে হয়ত জানতেও পার। তারপর ওই আবির্ভাব—

হ্যাঁ, ওখানেও একটা ধোঁয়া।

তাই বুঝি ?

হ্যাঁ। ওই বিনয়ভূষণকে শশধর বাবুর স্ত্রী জানতেন না। তবে একটা সংবাদ পেয়েছি, দিন পনের আগে দোকানের চাকরি থেকে নাকি বিনয়কে বরখাস্ত করেছিলেন শশধর সরকার।

কি করে জানলে ?

দোকানের একজন কর্মচারী, যতীন সমাদ্দারই বললে এনকোয়ারির সময়। যে ফোন করেছিল শশধরের স্ত্রী সুনয়না দেবীকে সে বিনয়ভূষণের নাম করে ওই সব বলে। তাছাড়া আরও একটা কথা আছে, সে-রাত্রে নাকি বিণয়ভূষণ কলকাতাতেই ছিল না।

তবে কোথায় ছিল ?

অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা যায়, বিকাশ বললে, বিনয়ভূষণ দিন দশেক আগে থাকতেই তার বৌবাজারের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে শ্রীরামপুরে চলে গিয়েছিল সেখানে একটা দোকানে চাকরি পেয়ে। সে-রাত্রে সে শ্রীরামপুরেই ছিল। ওই দিন সকালে কলকাতায় আসে কি একটা কাজে।

কিরীটী বললে, তা বিনয়ভূষণের চাকরি গিয়েছিল কেন, জানতে পেরেছ কিছু ?

হ্যাঁ চুরির ব্যাপারে—

চুরি ?

হ্যাঁ। কিছু দামী জুয়েলস চুরির ব্যাপারের সন্দেহে তার চাকরি যায়।

আচ্ছা শশধর সরকারের ফ্যামিলি মেম্বারস ক'জন ? কে কে আছে বাড়িতে ?

নিঃসন্তান ছিলেন উনি। স্ত্রী এবং একটি পোষ্য ভাইপো সরকার—আর চাকরবাকর, দারোয়ান, ড্রাইভার।

রাজীব সরকার কি করে?

সেও তার কাকার সঙ্গে দোকানেই বসত। এখন বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা যেমন ধোঁয়াটে তেমনি রীতিমত রহস্য জনক। আমি তো মিঃ রায় কোন আলোর বিন্দুও কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।

সুনয়না দেবী ও রাজীব সরকারকে ভালভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলে?

করেছি।

তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করেও কিছু জানতে পারা গেল না?

না। তাঁরা বললেন, শশধরবাবু নাকি অত্যন্ত অমায়িক ও সৎ চরিত্রের লোক ছিলেন। কখনও কারও সাতে বা পাঁচে থাকতেন না। তার কোন শত্রুও ছিল না ওই ভাবে তাঁর মৃত্যুটা তাঁদের কাছে কল্পনাতীত।

আচ্ছা দোকানটা কত দিনের? কিরীটী প্রশ্ন করে।

শুনলাম দোকানটা নাকি উনিই করেছিলেন—বছর পাঁচেক হল। ছোট দোকান থেকে পাঁচ বছরে বিরাট কারবার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ওটা পৈতৃক সম্পত্তি নয় তাহলে? পাঁচ বছরের ঐশ্বর্য?

হ্যাঁ। ওঁর বাপ রামজীবন সরকার সামান্য একজন কারিগর ছিলেন। শশধরও তাই ছিলেন। বাপ বছর আষ্টেক আগে মারা যান। বছর পাঁচেক আগে কাজ ছেড়ে দিয়ে কিছুদিন বসেছিলেন, তারপর ছোট্ট একটা দোকান খোলেন। তারপর ধীরে ধীরে—

নিজের চেষ্টা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে সরকার জুয়েলারীর আবির্ভাব—তাই তো?

হ্যাঁ।

তা·শশধর কোথায় চাকরি করত, কোন্ দোকানে কিছু জানা গেছে ?

সে খবরও নিয়েছি, বিরাট জুয়েলার্স বি, কে, সরকার অ্যাণ্ড সন্সের নামটা আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে—

মনে থাকবে না কেন ? সে তো বছর পাঁচেক আগে কি সব আভ্যন্তরীণ কারণে প্রতিষ্ঠানটা বন্ধ হয়ে যায়।

হ্যাঁ, সেখানেই চাকরি করতেন শশধর সকার এক সময়।

কিরীটী কিছুক্ষণ যেন কি ভাবল। তারপর বিকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, একটা খোঁজ নিতে পার বিকাশ—

কি বলুন তো ?

বি. কে. সরকার অ্যাণ্ড সন্সের মালিক বা মালিকদের কেউ আছেন কিনা এবং যদি থাকেন তো বর্তমানে কে কোথায় আছেন কি করছেন—

তা পারব না কেন ?

হ্যাঁ, খবরটা সংগ্রহ কর তো। ভাল করে সন্ধান নাও। আলোর বিন্দু হয়ত দেখতে পাব এক-আধটা, আর—

আর কি ?

সংবাদপত্রের ওই বিজ্ঞাপনের কথাটা যেন ভুলে যেও না।

একটা কথা বলব মিস্টার রায় ?

বল।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত ওই বিজ্ঞাপনটার সঙ্গে নীল রুমাল হত্যা-রহস্যগুলোর সত্যিই কোন যোগাযোগ আছে বলে কি আপনি মনে করেন মিস্টার রায় ?

নাও থাকতে পারে। হয়ত কোনটার সঙ্গেই কারও কোন সম্পর্ক নেই। কিরীটী মৃদু হেসে বললে।

তবে ?

সেই যে একটা কবিতা আছে না—যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, মিলিলে মিলিতে পারে—, কিন্তু থাক না বিকাশ, এবার আমি একটু বেরোব।

বিকাশ বুঝতে পারে, কিরীটী আপাততঃ বর্তমান প্রসঙ্গের উপর যবনিকাপাত করতে চায়। কিরীটী রায়কে বিকাশ ভাল করেই চেনে। যতটুকু সে বলছে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, তার বেশি একটা কথাও তার মুখ থেকে আর এখন বের করা যাবে না।

তাহলে আমিও উঠি।

এস। বিকাশ সেন উঠে পড়ল।

॥ তিন ॥

ঘণ্টাখানেক বাদে কিরীটীও বের হচ্ছে দেখে কৃষ্ণা শুধোয়, বেরোচ্ছ নাকি?

হ্যাঁ, একটু ডালহাউসি যাব।

সংবাদপত্র 'প্রত্যহে'র অফিসে বোধ হয়?

ঠিক।

তোমার কি সত্যিই মনে হয়—

কি?

ওই বিজ্ঞাপনটার সঙ্গে—

নীল রুমাল হত্যা রহস্যের কোন যোগাযোগ আছে কিনা?

হ্যাঁ, মানে—

কিন্তু কৃষ্ণার কথা শেষ হল না, নিচের কলিং বেলটা বেজে উঠল। কৃষ্ণা বললে, ওই দেখ, আবার যেন কে এল। সুব্রত ঠাকুরপো বোধ হয়—

মনে হচ্ছে, না। তার বেল বাজানো ঠিক ওই রকম নয়।

ওই সময় জংলী এসে ঘরে ঢুকল, বাবুজী !

কি রে ?

একজন ভদ্রলোক দেখা করতে চান।

ভদ্রলোক ! কোথা থেকে আসছেন ?

তা তো কিছু বললেন না, বললেন আপনার সঙ্গে কি বিশেষ দরকার আছে।

যা, ডেকে নিয়ে আয়।

জংলী নিচে চলে গেল। কৃষ্ণাও ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল, কিরীটী তাকে সম্বোধন করে বললে, এখন আর বেরোব না।

সেই ভাল, ফুলকপির সিঙাড়া ভাজছিলাম—

সুব্রতকে খবর দিয়েছ ?

কালই ফোনে বলেছি, এখুনি হয়ত এসে পড়বে।

ঠিক আছে, তুমি যাও।

কৃষ্ণা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যায়। কিরীটী কান পেতে শোনে। দু-জোড়া শব্দ। প্রথম শব্দটা জংলীর, তার সঙ্গে যে শব্দটা কানে আসে, সেটা থেমে থেমে। হাতে বোধ হয় একটা লাঠি আছে, লাঠির শব্দও কানে আসে।

সত্যিই তাই। পরমুহূর্তে জংলীর পেছনে পেছনে যে লোকটি ঘরে প্রবেশ করে, তার বয়স খুব বেশি না হলেও দেখলে মনে যেন অকালে বুড়ো হয়ে গেছে। রসকস-হীন শুকনো-পাকানো চেহারা মুখটা সম্বাটে ধরণের, মুখে চাপদাড়ি, কণ্ঠার হাড় দুটো প্রকট, কপালে একটা জড়ুল চিহ্ন। দুটি চোখে যেন শৃগালের মত অস্থির সতর্ক দৃষ্টি। ডান পা'টা মনে হয় পঙ্গু, হাতে একটা মোটা লাঠি। পরনে দামী শান্তিপুরী ধুতি, গ্রে কালারের গরম সার্জের পাঞ্জাবির ওপরে একটা দামী কাশ্মিরী শাল জড়ানো।

নমস্কার।

কিরীটী প্রতিনমস্কার জানায় হাত তুলে, নমস্কার, বসুন।

হ্যাঁ, এই যে বসি। ভাঙা ভাঙা একটু যেন মোটা কর্কশ স্বর।

কোনমতে আগন্তুক কিরীটীর মুখোমুখি সোফাটার ওপরে বসে পাশে তাঁর লাঠিটা রাখলেন। তারপর বললেন, আপনি নিশ্চয় রায়মশাই?

হ্যাঁ।

আগন্তুক পকেট থেকে একটা সোনার সিগারেট কেস বের করেন, কেস থেকে একটা দামী বিলাতী সিগারেট নিয়ে, কেসটা কিরীটীর দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, সিগারেট!

না, ধন্যবাদ!

সিগারেট চলে না বুঝি? ধূমপানে বুঝি অভ্যস্ত নন? তা ভাল, বড় বদ অভ্যাস—

চলে, তবে সিগারেট নয়—সিগার আর পাইপ।

সুদৃশ্য একটা ম্যাচবক্স-হোলডার থেকে একটি কাঠি বের করে সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করতে তৎপর হন আগন্তুক।

কিরীটী লক্ষ্য করে, আগন্তুকের দু'হাতের তিন আঙুলে আংটি তার মধ্যে ডান হাতের অনামিকায় যে আংটিটা রয়েছে, সেটায় একটা বেশ বড় সাইজের হীরে বসানো রয়েছে এবং আংটি দুটো মীনে করা।

হীরেটার দাম খুব কম করেও হাজার দশেক তো হবেই। দামী হীরে। জ্বলজ্বল করছে। বেশভূষা, সোনার সিগারেট কেস, হাতের হীরের আংটি—সবকিছুই যেন নির্দেশ করছে যে আগন্তুক একজন ধনী ব্যক্তি।

সিঁড়িতে ওই সময় দ্রুত জুতো-পরা পায়ের শব্দ শোনা গেল।

কিরীটী বুঝতে পারে সুব্রত আসছে।

পরমুহূর্তেই সুব্রত ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে ওঠে, বৌদি—

কিন্তু বাকি কথা সব শেষ করতে পারে না। ঘরের মধ্যে কিরীটীর সামনে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখে থেমে গেল এবং সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কিরীটীর দিকে তাকাল।

আয় সুব্রত, বস।

বৌদি—

বস্, এখনও দেরী আছে।

সুব্রত বুঝতে পারে, কিরীটী তাকে বসতে বলছে। আর কোন কথা না বলে সে কিরীটীর পাশেই বসে পড়ল।

হাঁ, এবারে বলুন তো আমার কাছে আপনার কি প্রয়োজন? প্রশ্নটা করে কিরীটী আগন্তুকের দিকে দৃষ্টিপাত করল।

আমার নাম শিবানন্দ বসু। বালিগঞ্জে বোস অ্যাণ্ড কোং যে জুয়েলারী শপটা আছে—তার প্রোপাইটার মানে মালিক আমি।

তা আমার কাছে কি প্রয়োজন বলুন তো বোস মশাই?

ভদ্রলোক কেমন যেন একটু ইতস্ততঃ করতে থাকেন। আড়চোখে সুব্রতর দিকে তাকান।

ও সুব্রত, আমার অন্তরঙ্গ ও সহকারী। আমাকে যা বলার ওর সামনে আপনি তা নিঃসঙ্কোচে বলতে পারেন শিবানন্দবাবু। তারপর একটু থেমে কিরীটী বললে, মনে হচ্ছে বিশেষ কোন কারণে আপনি একটু চিন্তিত?

সত্যিই তাই রায় মশাই। ব্যাপারটা হচ্ছে—

বলুন?

আপনার নজরে পড়েছে কিনা জানি না, গত দু'মাসের মধ্যে এই শহরে—

আপনি কি সেই নীল রুমালের ফাঁস লাগিয়ে যে সব হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, সেই কথাই—

ঠিক তাই। কিন্তু আশ্চর্য, বুঝলেন কি করে ?

আপনি একজন নাম করা জুয়েলার বললেন না ? যাঁদের হত্যা করা হয়েছে, তাঁরাও সবাই জুয়েলার ছিলেন কিনা—

ঠিক সেই কারণেই এসেছি আপনার কাছে একটা পরামর্শের জন্য।

কিসের পরামর্শ বলুন তো ?

আমার কেমন একটা ভয় ঢুকেছে মনে। কে জানে এবার আমারই পালা কিনা।

কিরীটী হেসে ফেলে।

হাসছেন যে রায় মশাই ?

হাসছি এই কারণে, কলকাতা শহরে তো অনেক জুয়েলারই আছেন—বলতে বলতে হঠাৎ কিরীটী শিবানন্দর মধ্যমায় মীনা করা আংটিটার দিকে তাকিয়ে থেমে যায়।

শিবানন্দর দৃষ্টি এড়ায় না বোধ হয় ব্যাপারটা। বলেন, কি দেখছেন ?

না, কিছু না। কি বলছিলেন বলুন ?

বুঝতেই পারছেন রায়মশাই, ব্যাপার-স্যাপার দেখে আমি বড্ড নার্ভাস হয়ে পড়েছি—

কেন বলুন তো ?

বলেন কি ! বেটাদের যত আক্রোশ তো দেখছি সব আমাদের জুয়েলার্সদের ওপরেই। বেটারা যেন আমাদের সব খতম করবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। তাই ভয়ে ভয়ে আছি সর্বক্ষণ। রাতে ঘুম নেই, আহারে রুচি নেই—জেগে জেগে যেন কেবলই ওই নীল রুমালের আতঙ্ক দেখছি, ভয়াবহ এক বিভীষিকা—

তা শিবানন্দবাবু, সেজন্য আমার কাছে এসেছেন কেন ? আমি তো আর আপনাকে কোন প্রোটেকশান দিতে পারব না ! তা যদি কেউ পারে তো পুলিসই পারবে।

তা কি আর জানি না রায় মশাই—

তবে ?

পুলিস হয়ত আমার কথায় কানই দেবে না।

তা কেন ? বলেন তো টালিগঞ্জ থানার ও-সি কে আমি বলে দিতে পারি—

না না, মশাই, বরং অপনি যদি কোন পথ বাৎলাতে পারেন—

না, ক্ষমা করবেন। তাছাড়া—

আহা, সাহায্য না করতে পারেন, উপদেশ তো কিছু দিতে পারেন!

বাড়িতে গোটা-দুই দারোয়ান রাখুন।

তা কি আর বাকি রেখেছি রায় মশাই—তিন-তিনজন দারোয়ান বহাল করেছি। তবু নিশ্চিন্ত হতে পারছি না, স্বস্তিতে বাইরে ঘোরা-ফেরা পর্যন্ত করতে পারছি না।

সুব্রত কিরীটীর পাশে বসে নিঃশব্দে এতক্ষণ শিবানন্দ বোসের কথাবার্তা শুনছিল। এবারে বললে, আপনি বরং এক কাজ করুন শিবানন্দবাবু—

কি বলুন তো ?

মাসখানেকের জন্য কাউকে কোথায় যাচ্ছেন না জানিয়ে বাইরে কোথাও গিয়ে কাটিয়ে আসুন।

সেই পরামর্শ দিচ্ছেন!

হ্যাঁ। নীল রুমালের ব্যক্তিটির সত্যিই যদি আপনার উপরে কোন আক্রোশ থাকে তো মাসখানেক অন্ততঃ তো আপনার খোঁজ পাবে না—

কিন্তু তারপর ? সব কিছু ফেলে দিয়ে তো আমি অজ্ঞাতবাসে বাকি জীবনটা কাটাতে পারি না। তাছাড়া শেষ পর্যন্ত যদি তারা আমাকে খুঁজে বের করে ফেলে।

শিবানন্দবাবু? কিরীটী আবার কথা বলে।

আজ্ঞে!

আপনার ছেলেমেয়ে কটি?

নেই।

নেই মানে? আপনার কোন সন্তানাদি নেই?

না। আমার স্ত্রীর কোন সন্তান হয়নি। দুঃখের কথা আর বলেন কেন?

তবে আপনার বিষয়-আশয়ের ওয়ারিশন কে?

কে আর—ওই নান্টু, বোম্বেটে ভাগ্নেটারই শেষ পর্যন্ত হবে পোয়া বারো।

ভাগ্নে!

হ্যাঁ, ভাগ্নে নয়—বলতে পারেন কুলাঙ্গার। লেখাপড়া করল না, মানুষ হল না, কাজকর্মও শিখল না। সর্বক্ষণ পার্টি করে বেড়ায়।

কোন্ পার্টির লোক তিনি!

কে জানে মশাই, এদেশে তো হাজারটা পার্টি। নামও জানি কি ছাই তার, যে বলব কোন্ পার্টি শ্রীমানের। বুঝলেন, দিতাম গলা-ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে বাড়ি থেকে, কিন্তু ওই যে—

কি?

তার মামী—আমার অর্ধাঙ্গিনীটি, সে যে নান্টু বলতে অজ্ঞান! বলেছিলাম একবার তাড়িয়ে দেব, তা ঘন ঘন ফিট হতে শুরু করল গিন্নীর। শেষে সাপের ছুঁচো গেলার মত চুপ করে রামবুদ্ধু হয়ে বসে আছি। মরুক গে—যা খুশি ওরা করুক গে। অথচ মশাই ছেলেটা লেখাপড়ায় ভালই ছিল—

তাই বুঝি?

হ্যাঁ। বিদ্যাসাগরে বি. এস-সি. পড়ছিল, তারপরই মাথায় ঢুকল

পোকা। ব্যস, সব কিছু শিকেয় উঠল। এখন দিবা-রাত্র করছেন আর আমার অন্নধ্বংস করছেন।

কিরীটী মনে মনে বলে, ঠিকই করছে—বর্বরস্য ধনক্ষয়! কিন্তু মুখ দিয়ে তার সে কথাটা বের হয় না, কেবল মিটিমিটি হাসে।

শিবানন্দ এবারে বললেন, আমি অবিশ্যি আপনার পরামর্শ এমনি চাই না, তার জন্যে পারিশ্রমিক দিতে আমি কার্পণ্য করব না—

ঠিক আছে শিবানন্দবাবু, আপনার কথাটা আমি ভেবে দেখব।

দেখবেন?

হ্যাঁ, দেখব।

ব্যস, ব্যস—তাহলেই আমি খুশি। বড় বিপদে পড়েছি রায় মশাই, এ বিপদ থেকে আপনি আমাকে উদ্ধার করুন—আমিও আপনাকে খুশি করে দেব। আচ্ছা তাহলে আমি উঠি। নমস্কার।

নমস্কার।

শিবানন্দ অতঃপর উঠে পড়লেন এবং লাঠির সাহায্যে পঙ্গু ডান পা-টা সামান্য টেনে টেনে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

কিরীটী একদৃষ্টে শিবানন্দর ক্রমঅপস্রিয়মাণ দেহটা ও চলার ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে ছিল।

সুব্রতর সেদিকে নজর পড়ায় বললে, কি দেখছিস রে কিরীটী?

কিরীটী সে কথার জবাব না দিয়ে বললে, কেমন বুঝলি সুব্রত!

কিসের কি বুঝলাম?

বলছিলাম, ভদ্রলোকের আগমন ও প্রত্যাগমন থেকে কি তোর মনে হল!

বেশ ভয় পেয়ে গেছেন মনে হল।

তা ঠিক, তবে ওই যে একটা কথা আছে না আমাদের দেশে—

কি?

ভেক না নিলে ভিক্ষে মেলে না!

সুব্রতর কথায় জবাব দেওয়া হল না, কৃষ্ণা এসে ঘরে প্রবেশ করল। হাতে তার প্লেটে গরম গরম সিঙাড়া।

সুব্রতও সব কিছু ভুলে গিয়ে হাত বাড়িয়ে কৃষ্ণার হাত থেকে প্লেটটা নিয়ে নিল এবং বিনা বাক্যব্যয়ে সিঙাড়ার সদ্ব্যবহার শুরু করে দিল।

কৃষ্ণা মুখোমুখি বসতে বসতে বললে, কে এসেছিল গো?

কিরীটী মৃদু কণ্ঠে হেসে বললে, নীল রুমাল।

মানে!

ওই আর কি। নীল রুমালের আতঙ্কে আতঙ্কিত এক ভদ্রলোক। সুব্রত বললে। তাই নাকি? কি রকম?

সুব্রতই সংক্ষেপে ব্যাপারটা বিবৃত করে গেল সিঙাড়ার স্বাদ নিতে নিতে।

কিরীটী হঠাৎ ওই সময় বলে ওঠে, ব্যাপারটা নিয়ে আজ সকাল থেকে চিন্তা করতে করতে একটা ব্যাপার আমার কাছে যেন এখন ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে সুব্রত—

কি বল তো?

নীল রুমালের ব্যাপারটায় পূর্বপরিকল্পিত দৃঢ় সঙ্কল্প কারও-না-কারও আছে। কিরীটী তার সামনের নিচু টেবিল থেকে সুদৃশ্য চন্দনকাঠের সিগারের বাক্সর ডালাটা খুলে একটা সিগার তুলে নিয়ে সেটায় অগ্নিসংযোগ করতে করতে বললে।

পূর্বপরিকল্পিত দৃঢ় সঙ্কল্প!

হ্যাঁ। এক দুই তিন—তিনজনকে হত্যা করা হয়েছে, এবারে চতুর্থ ব্যক্তির পালা, চারের অঙ্ক আর কি—

বলিস কি!

কিন্তু ভাবছি, সেই চতুর্থ কে? কার জন্য হত্যাকারীর নীল

ফাল্গুনী আমাদের

॥ চার ॥

~~রুমাল অপেক্ষা রয়েছে~~ সুব্রত বললে, তাহলে তুই বলতে চাস কিরীটী, নীল রুমালের ফাঁস আরও একজনকে গলায় নিতে হবে!

তাই তো মনে হচ্ছে। তবে—

তবে কি? এবারে ওই শিবানন্দরই পালা নাকি?

কিরীটী মৃদু হাসল।

হাসছিস যে! আমারও মনে হয়—

কি মনে হয় রে?

ভদ্রলোক যেভাবে ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে তোর কাছে ছুটে এসেছিলেন—

কিন্তু ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিপরীতও তো হতে পারে?

মানে?

অতি সতর্কতায় মতিভ্রম! যাকগে সে কথা। তারপরই হঠাৎ যেন কি মনে পড়েছে, এমনি ভাবে সুব্রতর দিকে তাকিয়ে বললে, হ্যাঁ রে সুব্রত—

কি?

হীরেন সরকারের সঙ্গে তোর জানাশোনা ছিল না?

কোন্ হীরেন সরকারের কথা বলছিস।

আরে, ওই যে সরকার জুয়েলার্সদের বাড়ির ছেলে—

হ্যাঁ ছিল তো। তা কি হয়েছে তাতে?

তাকে একবার ডাকতে পারিস?

পারব না কেন? দীর্ঘকাল দেখা-সাক্ষাৎ নেই অবিশ্যি, তাহলেও দেখা করে তোর কথা বললে আসবেই। কিন্তু কেন?

কেন আবার কি—একটু আলাপ-সালাপ করতাম ভদ্রলোকের সঙ্গে আর কি।

কি হবে আলাপ করে ?

কোথা থেকে কি হয়, কেউ কি কিছু বলতে পারে—না তাই কিছু বলা যায় ?

বেশ, কালই যাব তার ওখানে একবার।

তাই যাস। আচ্ছা তোরা বস্, আমি বিকাশকে একটা ফোন করে আসি। বলতে বলতে কিরীটী উঠে পড়ল সোফা থেকে।

কিন্তু ফোনে বিকাশ সেনকে থানায় পাওয়া গেল না, তখনও থানায় ফিরে যায় নি। এ. এস. আই বললেন, কখন ফিরবেন তিনি বলতে পারেন না।

কিরীটী ফিরে এসে সোফায় বসতে বসতে বললে, খুব করিৎকর্মা ব্যক্তি আমাদের এই বিকাশ সেন। হয়ত সকালে আজ যা বলেছি, সেই সব নিয়েই সে মেতে উঠেছে। যাক গে, মরুক গে—তারপর তোর ব্যাপার কি বল্ তো সুব্রত !

কেন ? ব্যাপার আবার কি ?

এদিকে যে ভুলেও পা মাড়াস না !

কে বললে ? প্রায়ই তো আসি, কৃষ্ণাকে জিজ্ঞাসা কর্।

সুব্রত কখনও কৃষ্ণাকে নাম ধরে ডাকে, কখনও বৌদি বলে ডাকে।

কি করিস বাড়িতে বসে বসে ?

কি আর করব, বই পড়ি।

তা ভাল। শেষ পর্যন্ত দেখবি, এই শুকনো বইয়ের পাতাগুলো ক্রমশঃ আরও নীরস হয়ে উঠেছে। বুঝলি না তো সময়ে! অত করে বললাম তখন, চোখ কান নাক মুখ বুজে ঝুলে পড়্।

সুব্রত হাসতে হাসতে বলে, দুঃখ হচ্ছে ?

আমার নয়, তোর—তোর কথা ভেবে সত্যিই দুঃখ হচ্ছে। কুন্তলার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিস ?

না।

কেন ?

কেন আবার কি, প্রয়োজন হয় না বলে !

মেয়েটাও হয়েছে তেমনি কৃষ্ণা, সুব্রতটা বুড়বাক বলে সেও গোঁ ধরে বসে আছে।

কৃষ্ণা চুপ করে থাকতে পারে না, বলে, দায় পড়েছে তার ! হ্যাংলামি করতে যাবে কেন—তার নিজস্ব একটা প্রেসটিজ্ নেই !

প্রেসটিজ ! একে তুমি প্রেসটিজ বল কৃষ্ণা !

তা নয় তো কি ?

বাইরে প্রেসটিজের মিথ্যে একটা মুখোস মুখে এঁটে, ভেতরে ভেতরে সর্বক্ষণ চোখ মোছা—

থাম তো—মেয়েদের তুমি ভাব কি !

ঠিক যা ভাবা উচিত তাই ভাবি।

সুব্রত ওদের কথা শোনে বসে বসে, আর মৃদু মৃদু হাসতে থাকে।

তরল হাসি-গল্পের মধ্যে দিয়ে আরও অনেকক্ষণ কাটিয়ে এক-সময় সুব্রত যাবার জন্য যেমন উঠে দাঁড়িয়েছে, কৃষ্ণা বললে, এ কি, উঠছ কোথায় ?

বাঃ, যেতে হবে না !

হবে। তবে বিকেলে—দুপুরের খাওয়া এখানে।

সুব্রত বসে পড়ে বললে, তথাস্তু দেবী।

হাতে কিছু কাজ ছিল বিকাশের। কাজগুলো সারতে সারতে বেলা দুপুর গড়িয়ে যায়। প্রায় দেড়টা নাগাদ সে থানায় ফিরে এল।

অতক্ষণ ধরে কাজ করলেও তার মাথার মধ্যে কিন্তু সর্বক্ষণ কিরীটীর সকালের কথাগুলোই ঘোরাফেরা করছিল।

কিরীটী যা বললে, তা কি সত্যি। তিন-তিনটি হত্যার মধ্যে সত্যিই একটা সুস্পষ্ট যোগাযোগ আছে। অবিশ্যি তিনটি হত্যার মধ্যে দুটি ব্যাপারে অদ্ভুত মিল আছে—প্রথম, প্রত্যেকেই শহরের জুয়েলার্স, অবস্থাও ভাল; দ্বিতীয়, প্রত্যেকেরই গলায় নীল রুমাল পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। আর সেই কারণেই কি কিরীটীর ধারণা, একইব্যক্তি তিন-তিনটি ওই নিষ্ঠুর হত্যার পিছনে রয়েছে? একজনেরই অদৃশ্য হাতের কারসাজি তিনটি হত্যাই?

আশ্চর্য নয়!

কিন্তু কথা হচ্ছে, উদ্দেশ্য কি থাকতে পারে ওই ধরনের নৃশংস হত্যার?

কি উদ্দেশ্যে একটা লোক অমন নৃশংস ভাবে একটার পর একটা জুয়েলারকে এ শহরে হত্যা করে চলেছে?

ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ কি?

কিন্তু কিসের আক্রোশ? কি ধরনের আক্রোশ?

ঝনঝন করে পাশে টেলিফোনটা টেবিলের উপরে বেজে উঠল। আঃ, শালারা একটু নিশ্চিন্তে বসে বিশ্রামও করতে দেবে না! ঘণ্টা চারেক হন্তদন্ত হয়ে রোদে ছোটাছুটি করে এসে একটু বসেছি—, একান্ত বিরক্ত ভাবেই ফোনটা তুলে নিল: ও-সি, বৌবাজার স্পিকিং!

ও-প্রান্ত থেকে পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, কে বিকাশ—আমি কিরীটী!

সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ সেনের মুখের ওপর থেকে বিরক্তির মেঘটা যেন কেটে যায়। সে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে, সোজা হয়ে বসে।

বলুন, বলুন রায় সাহেব—

তুমি এখান থেকে যাবার পর সকালে একবার ফোন করেছিলাম।

আমি এই ফিরছি। কি ব্যাপার বলুন তো? ফোন করেছিলেন কেন?

সকালে তখন কয়েকটা কথা তোমাকে বলতে পারিনি—

কি কথা?

এর আগে যে দুজন জুয়েলার এ শহরে নীল রুমালের ফাঁসে নিহত হয়েছে, তারা কোথায় কি ভাবে কখন নিহত হয়েছে এবং তাদের সম্পর্কে ডিটেলস্ খবরাখবর একটা যোগাড় করতে পার?

কিছুটা সংগ্রহ করেছি রায়সাহেব—

করেছ? খুব ভাল সংবাদ—

হ্যাঁ। আর সেই খবরের জন্যই এতক্ষণ বাইরে ঘুরে এলাম।

কি জানতে পারলে বল?

টেলিফোনেই বলব, না—

না, শোন, আমি আগামী কাল সকালেই দিন-কয়েকের জন্য দিল্লী যাচ্ছি প্লেনে—

হঠাৎ দিল্লী?

ওখানে এক মন্ত্রী-মশাইয়ের দপ্তর থেকে একটা গোপন কনফিডেনসিয়াল দলিল বেপাত্তা হয়ে গেছে, তাই মন্ত্রী মশাই কিছুক্ষণ আগে এক জরুরী ট্রাঙ্ককল করেছিলেন আমায়—

তাহলে?

কি তাহলে?

এদিককার কি হবে?

কিসের—তোমার নীল রুমাল রহস্যের?

হ্যাঁ!

ভয় নেই, আমার ধারণা বা অনুমান যদি মিথ্যা না হয়, তাহলে আমাদের নীল রুমালের ভদ্রলোকটি এখুনি আবার তাঁর কালো হাত প্রসারিত করবেন না, কিছুটা অন্ততঃ সময় নেবেন।

কিন্তু যদি না নেয়—

নেবে। অন্ততঃ দিন পনেরো-কুড়ি তো নেবেই—সাধারণ যুক্তিতে। কারণ—

কি?

পুলিসকে সে তৃতীয়বার বোকা বানাল, সেই আত্মশ্লাঘা বা আত্মতৃপ্তিটা অন্ততঃ কিছু দিন তো একটু যাকে বলে চেখে চেখে উপভোগ করবেই, মনে মনে হাসবে। ভয় নেই ভায়া, তার ওই আত্ম-অহমিকাই তার রথচক্র গ্রাস করবে ঠিক সময়ে। গতি রুদ্ধ হবে।

বলছেন।

হ্যাঁ, বলছি। যাক, যা বলছিলাম, ওই খবরগুলো কিভাবে সংগ্রহ করলে?

ফোনেই বলি—

না, থাক। বরং তুমি এখন আছ তো?

হ্যাঁ।

আমিই কিছুক্ষণের মধ্যে যাচ্ছি। সংবাদটা ফোন মারফৎ আদান-প্রদান না হওয়াই ভাল।

অন্য প্রান্তে কিরীটী ফোন রেখে দিল।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই কিরীটী থানায় এসে হাজির হল।

বিকাশ তখন স্নান সেরে চাট্টি মুখে দিয়ে কোনমতে সবেমাত্র নিচের অফিসে এসে বসেছে।

আসুন মিস্টার রায়!

তারপর, বল। কিরীটী বসতে বসতে বললে, কতটুকু কি সংবাদ সংগ্রহ করলে ?

প্রথম ব্যক্তি নিহত হয় নীল রুমালের ফাঁসে, ঠিক আজ থেকে ছ'মাস আগে এক শনিবার আটটা-নটার মধ্যে কোন একসময়। কারণ—

কারণ ? কিরীটী বিকাশের মুখের দিকে তাকাল।

রাত সোয়া আটটা নাগাদ শ্যামবাজার অঞ্চলে তাঁর জুয়েলারীর দোকান বন্ধ করে বেরুতে যাবেন শ্রীমন্ত পোদ্দার, ঠিক তখন একটা ট্যাক্সি এসে থামে তাঁর দোকানের সামনে—

বলে যাও।

লোকটির যে বর্ণনা দোকানের কর্মচারীদের কাছে পাওয়া গেছে —তা হচ্ছে, লোকটি মধ্যবয়সী। রোগা। পাকানো চেহারা। পরনে দামী স্যুট।

আর কিছু ? আর কোন বিশেষত্ব ?

না, তেমন কিছু রিপোর্ট নেই আর।

হুঁ, বলে যাও।

॥ পাঁচ ॥

বিকাশ সেন আবার শুরু করে, আগন্তুক বলে, সে আসছে কোন এক বনেদী ধনীর বাড়ি থেকে। তার কর্তা তাকে পাঠিয়েছেন, কিছু গয়নার অর্ডার দেবেন ; তাই তাঁকে একটিবার তাঁর ক্যাটালগ বইটা নিয়ে তার সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধ জানান। শ্রীমন্ত পোদ্দার, বলাই বাহুল্য, উৎফুল্ল হয়ে সেই আগন্তুকের সঙ্গে দোকান বন্ধ করে তারই ট্যাক্সিতে সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে যান।

তারপর ?

সারাটা রাত তিনি বাড়িতে ফেরেন না, কাজেই ছোট ভাই ও তাঁর স্ত্রী ব্যস্ত হয়ে খোঁজখবর করেন।

অবিবাহিত ছিল শ্রীমন্ত পোদ্দার ?

হ্যাঁ। তারপর যা বলছিলাম, পরের দিন সকাল ছটা নাগাদ তাঁকে গঙ্গার ধারে স্ট্র্যাণ্ড রোডে এক বেঞ্চির উপর এক ভদ্রলোক বেড়াতে গিয়ে আবিষ্কার করেন। বেঞ্চির উপর উপবিষ্ট শ্রীমন্ত পোদ্দার, গলায় নীল রুমালের ফাঁস—মৃত। তিনিই একজন প্রহরারত পুলিশকে ডেকে সংবাদটা দেন। পকেটে ছিল শ্রীমন্ত পোদ্দারের একটি ব্যাগে শ'দুই টাকা, গোটা দুই চেক—প্রায় হাজার পাঁচেক টাকার, কিছু খুচরো পয়সা আর দোকানের চাবির গোছাটা।

অবিকল দেখছি তোমার শশধর সরকারের মতই ব্যাপারটা! স্রেফ হত্যার জন্যই হত্যা করা হয়েছিল শ্রীমন্ত পোদ্দারকেও তাহলে। কিরীটী বললে।

তাইতো দেখা যাচ্ছে।

তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি ?

তাঁর নাম হারাধন সামন্ত। তাঁরও জুয়েলারীর একটা দোকান ছিল রাধাবাজারে। দোকানের নাম সামন্ত জুয়েলার্স। বছর চারেক হল সাজিয়ে-গুছিয়ে জাঁকজমকের সঙ্গেই দোকানের পত্তন। শ্রীমন্ত পোদ্দারের মৃত্যুর ঠিক কুড়ি দিন পরের ঘটনা। তিনিও রাত আটটার পর দোকান বন্ধ করতে যাবেন, সেই সময়—

আবার এক আগন্তুকের আবির্ভাব তো ?

হ্যাঁ তবে এবার ট্যাক্সি নয়, একটা প্রাইভেট গাড়িতে চেপে তার আবির্ভাব ঘটে। কিছু দামী জড়োয়ার গয়না কিনবে, তাই এসেছিল। সঙ্গে হাতে ঝোলানো একটা কালো রঙের অ্যাটাচি কেস।

আগন্তুককে নিয়ে সামন্তমশাই তাঁর দোকানের প্রাইভেট রুমের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলেন। আধঘণ্টা পরে ভদ্রলোক বের হয়ে গেলেন। কর্মচারীদের মধ্যে জনা-দুই ও দরোয়ান তখনও প্রভুর ঘর থেকে বেরোবার অপেক্ষায় বসে, কিন্তু সামন্তমশাই আর ঘর থেকে বেরোন না। এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা, দু ঘণ্টা কেটে গেল, তখন একজন কর্মচারী অধৈর্য হয়েই গিয়ে দরজার সামনে এসে ডাক দিল।

কোন সাড়া পাওয়া গেল না সামন্তর, তাই না?

হ্যাঁ, দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে কর্মচারীটি চিৎকার করে উঠল। চেয়ারের ওপরে উপবিষ্ট সামন্তমশাই, গলায় নীল রুমালের ফাঁস, মুখটা সামান্য হাঁ হয়ে আছে, চোখের মণি দুটো যেন কোটর থেকে ঠিকরে বের হয়ে আসছে।

হুঁ। আচ্ছা, সেই আগন্তুকের চেহারার কোন বর্ণনা পেয়েছে?

পেয়েছি। রোগা, পাকানো চেহারা, চোখে কালো কাচের একটা চশমা, পরনে দামী স্যুট।

কিরীটী যেন চিন্তিত। কি যেন ভাবছে মনে হল।

বিকাশ বলতে লাগল, এবারেও কোন কিছু চুরি যায়নি।

স্বাভাবিক। কিরীটী মৃদু গলায় বললে, কারণ হত্যার জন্যই যেখানে হত্যা, সেখানে তো অন্য কিছুর নিদর্শন থাকতে পারে না। ভাল কথা, সামন্তমশাই বিবাহিত ছিলেন?

হ্যাঁ। স্ত্রী ও দু ছেলে, এক মেয়ে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল মৃত্যুর বছরখানেক আগেই খুব ধুমধাম করে। ছেলেদের একজনের বয়স বারো, আরেকজনের আট বছর। কিছুদিন আগে বালিগঞ্জ অঞ্চলে জমি কিনে বাড়ি তৈরি করতেও শুরু করেছিলেন।

আচ্ছা বিকাশ—

বলুন।

সেই রুমাল দুটো দেখেছ ?

হ্যাঁ। একজিবিট হিসেবে লালবাজারেই আছে। দেখে এলাম। অবিকল সেই একই ধরণের আকাশ-নীল রঙের রেশমী রুমাল এবং তাদের একটির কোণায় ইংরাজী সাঙ্কেতিক অক্ষর '1' ১ ও অন্যটিতে '2' ২ লেখা !

কিরীটী বললে, যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। তিনটি হত্যার পেছনে একই ব্যাক্তির অদৃশ্য হাত রয়েছে, সে সম্পর্কে আর কোন সন্দেহই রইল না।

আমারও এখন তাই মনে হচ্ছে। বিকাশ সেন বললে।

আরও একটা ব্যাপার হত্যাকাণ্ডগুলোর মধ্যে নিশ্চয়ই তোমার নজরে পড়েছে বিকাশ—

কি বলুন তো ?

প্রথম ব্যক্তি শ্রীমন্ত পোদ্দারের মৃত্যুর কুড়ি দিন পরেই নিহত হলেন হারাধন সামন্ত, এবং তার ঠিক দিন-কুড়ি পরে তৃতীয় ব্যক্তি নীল রুমালের ফাঁসে প্রাণ দিলেন আমাদের শশধর সরকার।

হিসেবে তো তাই দাঁড়াচ্ছে !

এবং দুবারে এক আগন্তুকের আবির্ভাব এবং তৃতীয় কিস্তিতে সামান্য অদল-বদল—a telephone call from some unknown person ! হয়ত শশধরেরও দোকানে প্রবেশ করে সেই রোগা লম্বা পাকানো চেহারার আগন্তুকের সঙ্গে মোলাকাত হয়েছিল। তাহলেই ভেবে দেখ, মোটামুটি হত্যাকারীর একটা চেহারার বর্ণনা যেমন আমরা পাচ্ছি, তেমনি এও বোঝা যাচ্ছে, হত্যাকারী একজন —একাধিক ব্যক্তি না। খুব planned wayতে সে হত্যা করে চলেছে একের পর এক।

আপনার কথায় তাই তো মনে হচ্ছে মিস্টার রায় !

তোমাকে এখন বাকি কাজটি করতে হবে সেন—

কোন্ কাজটা বলুন তো ?

বছর পাঁচেক আগে কি সব আভ্যন্তরিণ কারণে তুমি বলছিলে না, সরকার অ্যাণ্ড সন্স বিখ্যাত জুয়েলারী প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়—

হ্যাঁ।

কেন বন্ধ হয়েছিল,—কারণটা কি, এবং সেই পরিবারের সকলে এখন কে কোথায় আছে, কে কি করে, তাদের প্রত্যেকের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটা খোঁজখবর নিতে বলেছিলাম না—নিয়েছ ?

না। কিন্তু আপনার কি মনে হয় মিস্টার রায়—

কি ?

সেই প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারের সঙ্গে বর্তমান হত্যা-রহস্যগুলোর কোন যোগাযোগ আছে বলে আপনার মনে হয় ?

হয়ত নেই, আবার হয়ত থাকতেও পারে।

তাছাড়া ব্যাপারটা তো অনেক দিন আগেকার—

হ্যাঁ, পাঁচ বছর আগেকার ব্যাপার। কি জান বিকাশ, হত্যার বীজ যে এক-এক সময় কখন কোথায় কিভাবে রোপিত হয় বা অঙ্কুরিত হতে থাকে, কেউ তো বলতে পারে না। বিশেষ করে এই ধরনের হত্যার ব্যাপার। তাই ব্যাপারটা সম্পর্কে আমি জানতে চাই।

বেশ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংবাদগুলো আমি আপনাকে জানাবার চেষ্টা করব। সে আর এমন কঠিনই বা কি।

আজ তাহলে আমি উঠি, বুঝলে ?

চা খাবেন না ?

না।

কিরীটী উঠে পড়ল।

থানা থেকে বের হয়ে কিরীটী সোজা গেল তার গাড়িতে করে ডালহৌসি স্কোয়ারে 'প্রত্যহ' নামক দৈনিক সংবাদপত্রের নতুন হেড অফিসে।

সেখানকার একজন নিউজ-এডিটর সঞ্জীব লাহিড়ীর সঙ্গে কিরীটীর বিশেষ পরিচয় ছিল। অল্প বয়স, খুব চালাক-চতুর এবং চট্‌পটে ছোকরা।

সঞ্জীব তার অফিস-কামরায় ছিল না। মিনিট পনেরোর মধ্যেই হয়ত সে ফিরবে একজন বলায় কিরীটী তার ঘরে সে অপেক্ষা করতে থাকে।

বিশ মিনিট পরে সঞ্জীব ফিরে এল।

কিরীটীকে দেখে সে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে, দাদা যে! কি খবর?

একটা খবর চাই।

কি খবব?

কিরীটী তখন 'প্রত্যহে' প্রকাশিত বিচিত্র বিজ্ঞাপনটির কথা উল্লেখ করে বললে, একটু খোঁজ নিয়ে বলতে পার সঞ্জীব, ওই বিজ্ঞাপনটা কতদিন থেকে প্রকাশ হচ্ছে এবং কে দিয়েছে?

বসুন, আমি দেখছি।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই সঞ্জীব যা সংবাদ সংগ্রহ করে নিয়ে এল তা হচ্ছে—বিজ্ঞাপনটি গত দু'মাস ধরে প্রকাশিত হচ্ছে। দিল্লী থেকে নতুন এক পাবলিশার্স কনসার্ন বিজ্ঞাপনটি দিচ্ছে। বেদপাল পাবলিশিং কোম্পানি। দরিয়াগঞ্জে তার অফিস।

ঠিকানাটা টুকে নিয়ে কিরীটী উঠে পড়ল।

পরের দিন সকালের প্লেনেই কিরীটী দিল্লী চলে গেল।

সেখানে মন্ত্রী মশাইয়ের বাড়িতেই তার সঙ্গে দেখা হল কিরীটীর। প্রতিরক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মশাই রামস্বামী

বললেন ব্যাপারটা যেমন বিস্ময়ের, তেমনি অতীব রহস্যজনক মিস্টার রায়।

খুলে বলুন।

দপ্তরের এক বিশেষ secret document—যার মধ্যে ভারতের বর্ডারের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার details ছিল, সেটা অফিস-ঘরের সেফ থেকে খোয়া গেছে।

শেষ কবে documentটা দেখেছিলেন?

তা দিন পনের আগে।

চুরি গেছে যে জানতে পারলেন কবে?

দিন সাতেক আগে। প্রধান মন্ত্রী documentটা দেখতে চাইলে খোঁজ করতেই ব্যাপাটা জানা গেল।

সিন্দুকের চাবি কার কাছে থাকে?

Of course সর্বদা আমারই জিম্মায়।

তার মানে, সেফটা আপনি ছাড়া আর কারও খোলবার উপায় ছিল না?

নিশ্চয়ই না।

কে কে জানত আপনার অফিসের documentটা সম্পর্কে?

আমার personal secretary মিস্টার প্রতাপ সিং ছাড়া আর কেউ জানত না।

তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন?

করেছি। সে কিছু বলতে পারছে না।

ভদ্রলোক নিশ্চয়ই খুব বিশ্বাসী?

নিঃসন্দেহে।

কোথায় যেতে পারে বলে দলিলটা আপনার মনে হয়—মানে documentটা? Any idea?

খবর পেয়েছি সেটা পাকিস্তানে চালান হয়ে গেছে।

ক্ষতির সম্ভাবনা আছে তাতে নিশ্চয়ই ?

ক্ষতি ! তা কিছুটা তো আছে বটেই। কিন্তু তার চাইতেও বেশি যেটা চিন্তার কারণ হয়েছে, এভাবে যদি secrct documets সেক থেকে পাচার হয়ে যেতে থাকে—

সমূহ বিপদ !

বলুন, তাই নয় কি ? প্রধান মন্ত্রী তো বিশেষ খাপ্পা হয়েছেন—

স্বাভাবিক।

একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে, যেমন করে হোক।

আপনাদের Secret Intelligence Branch-এর officerরা কিছু করতে পারলেন না ?

তারা ওইটুকু সংবাদই সংগ্রহ করতে পেরেছে। সেগুলো পাকিস্তানে চালান হয়ে গেছে। I want your help, মিস্টার রায়।

দেখি কি করতে পারি।

মন্ত্রী মশাইয়ের ওখান থেকে বিদায় নিয়ে কিরীটী বেদপাল পাবলিশিং কোম্পানির খোঁজে দরিয়াগঞ্জে গেল।

কিন্তু যা সে মনে মনে আশঙ্কা করেছিল—ওই নামে কোন পাবলিশিং কোম্পানির কোন অস্তিত্বই নেই।

॥ ছয় ॥

দিন চারেক বাদে কিরীটী কলকাতায় ফিরে এল।

আগেই দিল্লী থেকে ট্রাঙ্ককল করে দিয়েছিল কিরীটী, গাড়ি এয়ারপোর্টে পাঠাবার জন্য।

বাড়ি পৌঁছে গাড়ি থেকে নেমে ঘরে ঢুকতেই দেখে সুব্রত বসে আছে।

সুব্রত জানত কেন কিরীটী দিল্লী গেছে। সে বললে, কি হল, দিল্লীর ব্যাপারের কোন হদিস করতে পারলি ?

ব্যাপারটা জটিল। সময় শেষ, তবে মনে হচ্ছে—

কি ?

কিরীটী সোফার ওপরে বসে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করতে করতে বললে, আমাদের বিকাশ সেনকে কথা দিয়েছি, নচেৎ কটা দিন ওখানে আরও থেকে প্রাথমিক ব্যাপারটা শেষ করে আসতাম।

কৃষ্ণা এসে ঘরে ঢুকল তার হাতে ছোট একটা ট্রের উপরে ধূমায়িত দু কাপ কফি নিয়ে।

শরীর ভাল আছে তো ? কৃষ্ণা সহাস্যে শুধায় কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে।

কফির কাপটা হাতে নিতে নিতে কিরীটী বললে, ভাল। নে সুব্রত।

সুব্রতও একটা কাপ তুলে নিল। কৃষ্ণা পাশেই বসল কিরীটীর।

শীতের ছোট বেলা বাইরে তখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। পড়ন্ত আলোর সঙ্গে একটা আবছায়া ঘনাচ্ছে যেন।

কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে কিরীটী বললে, এখানেও বেশ শীত পড়েছে দেখছি।

সুব্রত বললে, হ্যাঁ পরশু থেকে। দিল্লীতে শীত কেমন পেলি ?

রাজধানীর ব্যাপার তো, কিরীটী হাসতে হাসতে বললে, হাড়-কাঁপানো! তারপর তোর হীরেন সরকারের সঙ্গে দেখা করেছিলি সুব্রত ?

গিয়েছিলাম।

গিয়েছিলি ? কবে আসছে ?

তার পক্ষে আসা সম্ভব নয়।

কেন ? আসতে চায় না বুঝি ?

না। বেচারী মাস আষ্টেক ধরে একেবারে শয্যাশায়ী।

শয্যাশায়ী! কি—হয়েছে কি ?

লোয়ার মটোর প্যারালিসিসে পা দুটো পঙ্গু, শয্যা থেকে উঠতেই পারে না। রোগা হয়ে গেছে।

তাই নাকি!

তাই দেখলাম। বললে তুই ডেকেছিস, আলাপ করতে চাস—এ যে তার কি সৌভাগ্য! কিন্তু আসতে পারবে না—

কিরীটী বললে, তাতে আর কি হয়েছে, আমরাই না হয় যাব আজ।

আজই যাবি ?

হ্যাঁ। ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করা একটিবার বিশেষ দরকার। তা ভদ্রলোকের অবস্থা কেমন দেখলি ? দোকান উঠে যাবার পর—

দোকানটা ওদের তিনজনের ছিল—মানে জ্যাঠতুত, খুড়তুত তিন ভাইয়ের। ওদের বাবা কাকা জ্যাঠারা অনেক দিন আগেই মারা গেছেন।

তারপর ?

ওরা তিন ভাই-ই দোকানটা দেখাশোনা করছিল—চলছিলও বেশ। হঠাৎ একদিন আবিস্কৃত হল, ভেতরে ভেতরে শনির দৃষ্টি পড়েছে দোকানটার ওপরে।

তাই বুঝি ?

হ্যাঁ। যেদিন ব্যাপারটা আবিষ্কৃত হল, অর্থাৎ ওরা জানতে পারল, দেখলে ওদের কারিগরেরাই ওদের পথে বসিয়েছে।

কারিগরেরা পথে বসিয়েছে কিরকম ?

আসলে ওদের তিনজনের একজনও কাজকর্ম কিছু জানত না। ধনী গৃহের ছেলে,—সোনার চামচ মুখে দিয়ে সব জন্মেছিল। কখনও

দোকানের কাজকর্ম যেমন কিছু শেখবার চেষ্টা করেনি, তেমনি কাজকর্মও বুঝত না। ওদের ছোট কাকাই সব দেখাশোনা করছিল, তার আর দু ভাইয়ের মৃত্যুর পর ওরা মধ্যে মধ্যে সেজেগুজে দোকানে আসতে আর মোটা মাসোহারা নিত। তিন ভাই দামী গাড়িতে চড়ত, বাবুয়ানী করত। একজনের ছিল রেস খেলার বাতিক, একজনের দেশভ্রমণের বাতিক আর হীরেনের ছিল থিয়েটারের বাতিক—

থিয়েটার!

হ্যাঁ। ভাল চেহারা না থাকলেও অভিনয় সে ভালই করত। নামও করেছিল। একটা নামকরা পাবলিক রঙ্গমঞ্চে অ্যামেচার অভিনেতা হিসাবে অভিনয় করত। হীরেনের বাবা আগেই মারা গিয়েছিল। ছোট ভাই কর্তাদের মধ্যে। মেজকর্তার সন্তানাদি ছিল না। বড়কর্তার দুই ছেলে—হরেন্দ্র আর নীরেন্দ্র।

কিরীটী নিঃশব্দে শুনতে থাকে।

বাইরে আসন্ন সন্ধ্যার ধুসরতা নামে। সেই সঙ্গে শহর কলকাতার চাপ-চাপ ধোঁয়া।

সুব্রত বলতে লাগল, ছোটকর্তার মৃত্যুর পর তিন ভাই দোকানে বসতে শুরু করল। তবে ওই নামেই—সব ভরসা কর্মচারীদের ওপরেই। কেউ কোন কাজ জানে না। ওরা যা করে, যা বোঝায়—তাই ওরা বোঝে।

মাস আষ্টেক বাদে এক খরিদ্দার এল—ভদ্রলোক তো মহা খাপ্পা—

কেন?

যে গহনা তিনি করে নিয়ে গিয়েছেন, তার ষোল আনার মধ্যে বারো আনাই নাকি খাদ। পরীক্ষা করে দেখা গেল কথাটা মিথ্যা নয়, সত্যিই তাই। ওরা আর কি করে, খেসারত দিল মোটা টাকার।

Interesting !

কেবল ওই খরিদ্দারটিই নয়—বিরাট ঢালাও কারবার, মাস দুয়েকের মধ্যে আরও বিশজন খরিদ্দার ওই একই কমপ্লেণ নিয়ে এল। সোনায়ই যে কেবল খাদ তাই নয়, জড়োয়া গয়নার মধ্যে যেসব জুয়েলস দিয়েছে, তাও মেকী।

তিন ভাই মাথায় হাত দিয়ে বসল, এ কি ব্যাপার। কিন্তু তখন যা হবার হয়ে গেছে, তলে তলে দোকান ফাঁক। সোনা যত স্টকে ছিল এবং যত স্থেয়ার জুয়েলস ছিল, সব উধাও। ঝাঁঝরা হয়ে গেছে দোকানটা। সব চাইতে পুরনো চারজন কর্মচারী ছিল—তাদেরই তারা ডাকল, এবং কর্মচারী চারজন কারা জানিস ?

জানি। শশধর, শ্রীমন্ত আর হারাধন নিশ্চয়ই ? কিরীটী বললে।

তুই জানলি কি করে ?

জানি। কিন্তু চতুর্থ ব্যক্তির নামটি কি শিবানন্দ বসু ?

তুই জানলি কি করে ?

জানি। তারপর একটু থেমে বললে, তাহলে দেখছি, আমার আমার অনুমান ভুল নয়। কিরীটীর চোখের মণি দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ;

কৃষ্ণা বললে, কেমন করে ওদের নাম তুমি জানলে গো ? শশধর, শ্রীমন্ত আর হারাধন না হয়—

বিজ্ঞাপনের কবিতাটা তোমরা ভুলে গেলে কৃষ্ণা। তাছাড়া শিবানন্দ এসেছিল নিজেই।

তবে ? কৃষ্ণা শুধায়।

কি তবে ?

তাকেও মরতে হবে নাকি ?

অঙ্ক অনুযায়ী তাই তো হওয়া উচিত। কবিতার মিলের জন্যই।

যাক, ধোঁয়াটে ব্যাপারটা পরিষ্কার এখন বোঝা যাচ্ছে। খুব জটিল নয়।

হত্যাকারীকে ধরতে পেরেছ? কৃষ্ণা শুধায়।

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, একেবারে যে পারছি না তা নয়। তবে উদ্দেশ্যটা—হত্যার উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর মোটিভ যখন জানা গেছে, বাকি রহস্যটুকুও উদ্ঘাটিত করতে আর বেশি বেগ পেতে হবে না। তুই বস্ সুব্রত, স্নান করে জামা-কাপড়টা বদলে আসি।

কৃষ্ণা আর সুব্রত বসে বসে গল্প করে।

কিরীটী ভেতরে চলে যায়।

আধ ঘণ্টা পরে কিরীটী ফিরে এল। পরনে তার গরম পায়জামা ও পাঞ্জাবি, গায়ে একটা সাদা শাল।

সুব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে কিরীটী বলে, উত্তিষ্ঠ বৎস!

এখন কোথায় আবার বেরুবি?

কোথায় মানে? তোর সেই পরিচিত পঙ্গু ভদ্রলোক হীরেন সরকারের ওখানে!

এখুনি!

আজই এবং ইমিডিয়াটলি। চল্ ওঠ্। বেশি রাত হয়নি, মাত্র আটটা—শীতের রাত, এমন কিছু নয়।

সুব্রত জানে কিরীটীকে থামানো যাবে না। ও যখন যাবে বলেছে, তখন যাবেই। কাজেই সে উঠে দাঁড়াল।

এই রাত্রে না গিয়ে কাল সকালে গেলেই হত!

না না, চল্ হীরেনের সঙ্গে দেখা করতেই হবে।

কখন ফিরবে? কৃষ্ণা শুধায়।

বৌবাজার থেকে ফিরতে আর কতক্ষণ লাগবে! কিরীটী বলে।

সুব্রত বলে, সে তো বৌবাজারে থাকে না। সে এন্টালি

পৈতৃক বাড়ি তো কবেই দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে গেছে সরকারদের।

তবে? ভদ্রলোক এখন থাকেন কোথায়?

ল্যান্সডাউন মার্কেটের কাছে হীরেন অন্য একটা বাড়িতে থাকে। তাই নাকি? তবে তো সে কাছেই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তো তাহলে ফিরতে পারব! নে, চল্।

ওরা দুজনে বের হয়ে গেল।

॥ সাত ॥

ল্যান্সডাউন মার্কেটের কাছাকাছি—বাঁয়ে একটা রাস্তা, সেই রাস্তা দিয়ে ঢুকে একটা গলির মধ্যে দোতলা একটা বাড়ি।

নিচের ঘরে আলো জ্বলছিল। কলিংবেল টিপতেই একটু পরে ঘরের দরজাটা খুলে গেল, কে?

ওরা দুজনে দরজার গোড়াতেই তখনো দাঁড়িয়ে আছে।

তাদের সামনেই দাঁড়িয়ে একটি তেইশ-চব্বিশ বছরের তরুণী। পাতলা দোহারা চেহারা। পরনে একটা সিল্কের শাড়ি। চোখ-মুখ সুশ্রী না হলেও উচ্ছল যৌবনরসে ও প্রসাধনে সুন্দরই দেখাচ্ছিল তরুণীকে। দু হাতে চারগাছা করে সোনার চুড়ি।

কাকে চান?

সুব্রতই কথা বললে, হীরেন বাড়ি আছে?

আছেন। তরুণী বললে।

কিরীটী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তখন তরুণীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

সুব্রত বললে, বলুন গিয়ে তাকে, সুব্রত এসেছে—সঙ্গে কিরীটী।

নিচের ঘরে ওদের বসিয়ে তরুণী ওপরে চলে গেল এবং একটু পরেই ফিরে এসে ওদের বললে, কিন্তু এখন তো দেখা হবে না।

হবে না ? কেন ?

তিনি ঘুমোচ্ছেন।

ঘুমোচ্ছে। এত তাড়াতাড়ি ? সুব্রতই আবার প্রশ্ন করে।

রোজ এই সময়টা ঘুমের ওষুধ খান রাত্রে ঘুম হয় না বলে। ইঞ্জেকশান দেবার পর ঘুমোচ্ছেন।

ওঃ। তাহলে আর কি হবে! কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলে সুব্রত।

কিরীটী বললে, হুঁ। চল্, ফেরা যাক।

আচ্ছা, নমস্কার। আসি।

তরুণীও প্রতিনমস্কার জানালো দুটি হাত তুলে, নমস্কার।

ফিরে এসে ওরা গাড়িতে উঠে বসল।

কিধার জায়গা সাব ? হীরা সিং শুধায়।

একবার শ্যামবাজার চল হীরা সিং—নাট্যমঞ্চ থিয়েটারে।

হীরা সিং গাড়ি ছেড়ে দিল।

সুব্রত একটু যেন বিস্মিত হয়েই বলে, আজ তো বুধবার, থিয়েটার নেই!

জানি। মৃদুকণ্ঠে কিরীটী বলে।

তবে ?

সজনীবাবু নিশ্চয় আছেন, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করব।

সজনী গুপ্ত একজন নামকরা নাট্যকার ও নাট্য পরিচালক এবং দীর্ঘদিন ধরে নাট্যশালার সঙ্গে জড়িত।

গাড়ি চলেছে শ্যামবাজারের দিকে। কিরীটি চুপচাপ বসে সিগার টানছে।

ব্যাপার কি বল্ তো কিরীটি, হঠাৎ নাট্যমঞ্চে কেন ?

সন্দেহের একটা নিরসন করব মাত্র। কিরীটী মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয়।

কিসের সন্দেহ ?

চল্ না।

থিয়েটারের সামনে যখন ওরা এসে নামল, তখন রাত প্রায় সাড়ে আটটা। কাউণ্টার বন্ধ, তবে লবিতে আলো ছিল।

লবিতে দেওয়ালের শো-কেসে বর্তমান নাটকের সব স্টিল টাঙানো। কিরীটী গেটে উপবিষ্ট দারোয়ানকেই শুধাল, সজনীবাবু হ্যায় দারোয়ান ?

জী। উপরমে।

ওরা ওপরে উঠে গেল দোতলার সিঁড়ি দিয়ে। সরু প্যাসেজটার শেষ প্রান্তে সজনী গুপ্তর ঘর।

কিরীটী আর সুব্রত ঘরে ঢুকতেই সজনী বললেন, আসুন, আসুন—কি সৌভাগ্য আমার। বসুন, বসুন।

চেয়ারটা টেনে নিয়ে মুখোমুখি বসতে বসতে কিরীটী বললে, সজনীবাবু, আপনার নতুন নাটকের স্টীল দিয়ে নিশ্চয়ই একটা অ্যালবাম তৈরি করেছেন ?

হ্যাঁ। কেন বলুন তো ?

আছে সেটা এখানে ?

আছে।

একবার দেখতে পারি ?

দাঁড়ান, আগে চায়ের কথা বলি।' সজনী বেল বাজালেন।

বেয়ারা রামলাল এসে ঘরে ঢুকতেই তিনি আবার বললেন, তিন কাপ ভাল চা নিয়ে আয় রামলাল।

রামলাল চলে গেল।

সজনী ঘরের আলমারী খুলে একটা ফটোর অ্যালবাম বের করে কিরীটীর সামনে এগিয়ে দিলেন।

সুব্রত তখনও বুঝে উঠতে পারছে না, ব্যাপারটা কি। কেন

কিরীটী এখানে এল আর কেনই বা তার চলতি নাটকের নির্বাচিত দৃশ্যগুলোর অ্যালবামের প্রয়োজন হল।

কিরীটী অ্যালবামটা টেবিলের উপরে রেখে উল্টোতে উল্টোতে চতুর্থ পৃষ্ঠায় একটি ফটোর প্রতি সজনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললে, এই মেয়েটি কে সজনীবাবু ?

ও তো সঞ্চারিণী বিশ্বাস !

সুব্রতও ততক্ষণে ফটোটার ওপর ঝুঁকে পড়েই চমকে উঠেছে। কোথায় যেন মেয়েটিকে সে দেখেছে! কিন্তু কোথায় দেখেছে, সেই মুহূর্তে কিছুতেই মনে করতে পারলে না।

মেয়েটি কতদিন আপনার থিয়েটারে আছে ?

তা প্রায় বছর পাঁচেক হল। কিছু বেশিও হতে পারে। Talent আছে মেয়েটির। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু ঘরের মেয়ে—, কেন বলুন তো ?

হীরেন সরকারকে আপনি জানেন ?

জানব না কেন—একসময় তো এখানে অভিনয় করত, এখানকারই আর্টিস্ট ছিল।

অভিনয়-ক্ষমতা কেমন ছিল ?

খুব ভাল অভিনয় করত। বেচারী হঠাৎ মাস আষ্টেক আগে কি হয়ে যেন পঙ্গু হয়ে গেছে—একেবারে শয্যাশায়ী।

থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছেন ?

হ্যাঁ।

সঞ্চারিণী বিশ্বাসের সঙ্গে হীরেন সরকারের যথেষ্ট দহরম-মহরম ছিল, তাই না ?

সজনী হাসলেন।—ঠিক। এখনও বোধ হয় তার keeping-য়েই আছে সঞ্চারিণী।

হীরেন সরকারের তো আর্থিক অবস্থা এখন তেমন সুবিধার নয়, তবে—

তবু কেন সঞ্চারিণী তার সঙ্গে আছে, তাই না ?

হ্যাঁ।

ওসব মশাই ভালবাসাবাসির ব্যাপার—দুর্জ্ঞেয় !

কিরীটী হেসে বললে, তাই দেখছি।

ইতিমধ্যে চা এসে গিয়েছিল।

চা পান করতে করতে একসময় কিরীটী বললে, অসুখ হবার পর হীরেন সরকারের সঙ্গে আপনার আর কখনও দেখা হয়েছে সজনীবাবু ?

না। ওই সঞ্চারিণীর কাছেই মধ্যে মধ্যে তার খবর পাই।

রাত নটা নাগাদ অতঃপর কিরীটী উঠে দাঁড়াল।—আজ চলি সজনীবাবু।

কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো, হঠাৎ সঞ্চারিণী ও হীরেন সরকারের খোঁজখবরের আপনার কি প্রয়োজন হল রায়সাহেব ? সজনী প্রশ্ন করলেন।

একটা কবিতার শেষ পংক্তি মিলছিল না, সেটা মেলাবার জন্য এসেছিলাম আপনার কাছে।

কবিতার শেষ পংক্তি! কথাটা বলে সজনী কেমন যেন বিস্ময়ের সঙ্গে তাকান কিরীটীর মুখের দিকে।

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, হ্যাঁ। আচ্ছা চলি। Good night,

সুব্রতর কাছে ব্যাপারটা তখন স্পষ্ট হয়ে গেছে।

দুজনে এসে আবার গাড়িতে উঠে বসল।

কিরীটী বললে, কোঠি চল হীরা সিং।

হীরা সিং গাড়ি ছেড়ে দিল।

গৃহে প্রত্যাবর্তন করে আহারাদির পর কিরীটী, সুব্রত ও কৃষ্ণা তিনজনে বসবার ঘরে এসে বসল। জংলী ওদের কফি দিয়ে গেল।

এতক্ষণ কিরীটী একটা কথাও বলেনি, সুব্রতও তাকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি। তবে কিছু জিজ্ঞাসা না করলেও, সুব্রত কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ বুঝতে পারছিল, কোন কিছুর একটা সমাধানের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে সে পৌঁছেছে।

ভ্রূ-যুগল সরল। চোখে একটা আনন্দের দীপ্তি ঝকঝক করছে।

কিরীটী?

উঁ।

মনে হচ্ছে যেন—

কিসের কি মনে হচ্ছে?

নীল রুমালের রহস্য যেন তোর কাছে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে!

তা এসেছে। চারের অঙ্ক প্রায় মিলের মুখে। এখন কেবল শেষ পর্বের শেষ অধ্যায়ের পূর্ববর্তী অধ্যায়টি বাকি।

মানে?

শিবানন্দ-কাহিনী—

শিবানন্দ!

হ্যাঁ! প্রথমে শ্রীমন্ত, তারপর হারাধন, তারপর শশধর, এইবার শ্রীমান শিবানন্দের পালা। আর তাহলেই গ্রন্থ সমাপ্ত। কিন্তু ওই সঙ্গে একটা কথা কি মনে হচ্ছে জানিস?

কি?

ওরা প্রত্যেকই deserved it! তাহলেও একটা কথা থেকে যাচ্ছে—

কৃষ্ণা শুধোয়, কি গো?

কিরীটী বললে, আইন যদি সবাই যে যার খুশি মত হাতে তুলে নেয়, তাহলে আইন বলে আর কোন কিছুই থাকে না। আইন-আদালত সব প্রহসন হয়ে যায়। তাই বলছিলাম—

কি ? স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণা প্রশ্ন করে।

আইন ভাঙার দণ্ড আইনভঙ্গকারীকে মাথা পেতে নিতেই হবে। শান্ত গলায় কিরীটী জবাব দিল।

সুব্রত বললে, শিবানন্দকে তুই বাঁচাতে পারবি ?

পারব কিনা জানি না, তবে চেষ্টা করব। তার বাড়ির চারপাশে পাহারাও রাখা হয়েছে।

সুব্রত হঠাৎ উঠে পড়ে বলে, এবারে তাহলে উঠি রে—

কিরীটী বলে, মাথা খারাপ নাকি!

কৃষ্ণা বলে, আরে, তোমার বিছানা আমি করে রেখেছি।

॥ আট ॥

সুব্রত হাসতে হাসতে বলে, একেই বলে সুগৃহিণী।

কৃষ্ণাও হাসতে হাসতে প্রত্যুত্তর দেয়, তুমি কি বুঝবে গৃহিণীর স্বাদ—চিরটা কাল তো ব্রহ্মচর্য আশ্রমের পাণ্ডাগিরি করলে!

সুব্রত সখেদে বলে ওঠে, হায় ব্রুটাস, তুমিও—না, একটা ব্যবস্থা এবারে করতে হয় দেখছি—

কৃষ্ণা উৎসাহিত হয়ে উঠে বলে, সত্যি বলছ! কুন্তলাকে তাহলে সুসংবাদটা—

তিষ্ঠ—তিষ্ঠ দেবী, অত ব্যাকুল হয়ো না। সুব্রত বলে, আগে কৌশলে না হয় তার মতামতটা জেনে নাও।

সে আর জানতে হবে না, কৃষ্ণা বলে, হুঁ—বলে পাগলা খাবি, না আঁচাব কোথায়!

না না দেবী কৃষ্ণা, সে ভদ্রমহিলাটিকে তাহলে এখনও সম্যক চিনতে পারনি।

তাই বুঝি! আচ্ছা দেখি—

কিরীটি বাধা দেয়, কেন বাজে সময় নষ্ট করছ কৃষ্ণা, ও মহাপাষণ্ড, ওর মুক্তি নেই।

সুব্রত হো হো করে হেসে ওঠে, দেখছ! কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, তোমার স্বামীরত্নটি আমাকে কেমন চিনেছে! কিন্তু রাত কত হল?

সকলেই দেওয়ালের গায়ে বসানো সুদৃশ্য ইলেকট্রিক ওয়াল-ক্লকটির দিকে একসঙ্গে দৃষ্টিপাত করল।

রাত এগারোটা বেজে দশ মিনিট।

সুব্রত বললে, না, এমন কিছু রাত হয়নি।

কৃষ্ণা হেসে বলে কফি চাই তো?

সুব্রত বলে, এই জন্যই তো তোমাকে আমার এত পছন্দ—

খুব হয়েছে। বসো.আনছি।

কেন, জংলী—

জংলী! তার এখন মধ্যরাত্রি।

বলতে বলতে কৃষ্ণা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সুব্রত তার নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে শুয়ে পরেছে।

কৃষ্ণাও এতক্ষণে হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে।

রাত প্রায় পৌনে একটা।

শীতের রাত্রি, বাইরে যেন বরফ ঝরছে। ঠাণ্ডাও পড়েছে প্রচণ্ড। কিরীটী ঘুমোয় নি। সোফা-কাম-বেডটার ওপরে পিঠের তলায় একটা ডানলোপিলোর বালিশ দিয়ে মুখে পাইপ গুঁজে আধ-শোয়া আধ-বসা অবস্থায় রয়েছে। চোখ দুটি বোজা।

ব্যাপারটা মোটামুটি এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কিরীটীর কাছে।

দীর্ঘদিনের স্বর্ণব্যবসায়ী সরকার ব্রাদার্সের অত বড় নামকরা প্রতিষ্ঠানটা উঠে গিয়েছিল কোন একটা আভ্যন্তরিক গোলমালের

কলে নয়। বিরাট প্রতিষ্ঠানের ইমারতের তলায় কতকগুলো দুষ্টু ইঁদুর বাসা বেঁধেছিল এবং পুরাতন মালিকদের মৃত্যুর পর নতুন সব অনভিজ্ঞ তরুণ মালিকদের হাতে যখন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব এসে পড়ল, সেই সুবর্ণ সুযোগটির সদ্ব্যবহার করতে দুষ্টু ইঁদুরের দল এতটুকু দেরি করেনি।

কৌশলে ওদের অনভিজ্ঞতার সুযোগে প্রতিষ্ঠানটাকে ক্রমশঃ একটু একটু করে শোষণে শোষণে ঝাঁঝরা করে ফেলেছে।

নদীর এক পাড় ভেঙেছে, অন্য পাড় গড়ে উঠেছে।

হীরেন সরকাররা তিন ভাই সর্বস্বান্ত হয়েছে, আর অন্য দিকে শশধর, শ্রীমন্ত, হারাধন ও শ্রীমান শিবানন্দ নিভৃতে ওই বুদ্ধুদের চোখের আড়ালে আখেরটাই নিজের নিজের কেবল গুছিয়ে নেয়নি, এক-একজন শাঁসালও হয়ে উঠেছে।

তারপর একদিন অকস্মাৎ ভ্রাতৃত্রয়ের যখন চেতনা হল, তখন ওই চার মূর্তিকে ধরা-ছোঁয়ার আর উপায় নেই। প্রমাণ নেই—কোন প্রমান নেই।

অতএব যা হবার তাই হল, অতদিনকার অত বড় প্রতিষ্ঠানটা পাততাড়ি গোটাতে বাধ্য হল।

ওর সঙ্গে নাটকের প্রথম অঙ্কের উপরে হল যবনিকাপাত।

তারপর বেশ কিছুদিন পরে শুরু হল নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক। আবার যবনিকা উত্তোলিত হল রঙ্গমঞ্চের।

শ্রীমন্ত, শশধর, হারাধন, শিবানন্দ—যে যার মত করে জুয়েলারি শপ খুলে ব্যবসা শুরু করে দিল, সরকার প্রতিষ্ঠানের অন্ধকার সুরঙ্গ-পথে অর্জিত মূলধন নিয়ে। দিনে দিনে সকলেরই ভাগ্যদেবী প্রসন্ন হাস্যে তাদের প্রতি কৃপাবৃষ্টি করতে লাগলেন। কিন্তু চার মূর্তি তখনো কল্পনাও করতে পারেনি, তাদের ভাগ্যাকাশে মেঘের সঞ্চার শুরু হয়েছে।

মেঘ ক্রমশঃ ঘন হতে ঘনতর হতে থাকে।

তারপরই অতর্কিতে এল বজ্রাঘাত—সেই মেঘের বুক থেকে।

শ্রীমন্তকে তার মূল্য শোধ করতে হল। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হল। নম্বর এক।

তারপরই বজ্র নামল হারাধনের মাথায়, পাপের প্রায়শ্চিত তারও হল। নম্বর দুই।

দুজনের প্রায়শ্চিত-দিবসের মধ্যে মাত্র কুড়ি দিবসের ব্যবধান। ঠিক কুড়িদিন পরে আবার বজ্র নেমে এল। এবারে শশধর—নম্বর তিন।

কি চমৎকার অঙ্ক-শাস্ত্রনুযায়ী বিচার।

কোথাও কোন ত্রুটি বা ভুলচুক নেই। একটি একটি করে বোড়ের চাল।

এবারে মধ্যে আর দিন তের-চোদ্দ বাকি। পূর্ব-পরিকল্পনানুযায়ী যদি চলতে থাকে, তাহলে চতুর্থ—অর্থাৎ চারে বেদ—শ্রীমান শিবানন্দ।

আর তাহলেই দ্বিতীয় অঙ্কের উপরে যবনিকাপাত।

ঘটনাচক্রে তার দৃষ্টিতে যদি ওই অদ্ভুত বিজ্ঞাপনটা না পড়ত, তাহলে হয়ত দ্বিতীয় অঙ্কেই নিঃশব্দে শেষ হয়ে যেত।

প্রেক্ষাগৃহে অন্ধকার নেমে আসত। আর হয়ত কোনদিনই আলো জ্বলত না।

কিরীটী কথাগুলো ভাবতে ভাবতে আপন মনেই মৃদু হাসে।

কিন্তু ওই নাটকের সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে মঞ্চের গ্রীনরুমে আরও একটি যে নাটক সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রধান অভিনেতাটি কে?

নেপথ্যে থেকে কার অদৃশ্য কালো হাত একের পর এক নীল রুমালের ফাঁস গলায় পরাচ্ছে? নটশিরোমণি—সেই ব্যক্তি সন্দেহ নেই।

কি গো, শোবে না ?

কিরীটীর চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে যায় কৃষ্ণার ডাকে।

কে ? ও, কৃষ্ণা।

শুতে যাবে না ? রাত যে শেষ হতে চলল ?

কটা রাত ?

রাত আড়াইটে।

হ্যাঁ, চল।

কিরীটী শয়নকক্ষে প্রবেশ করে শয্যায় আশ্রয় নিল।

পরের দিন সকালে কিরীটীর যখন নিদ্রাভঙ্গ হল, অনেক বেলা হয়ে গেছে, বেলা প্রায় সাতটা।

প্রচুর রোদে ঘর ভরে গেছে।

কৃষ্ণা বার-দুই এসে চা নিয়ে ফিরে গেছে। ঘুমোচ্ছে দেখে কিরীটীকে আর ডাকে নি।

সাতটা নাগাদ কিরীটীর ঘুম ভাঙতেই দেখে ঘরে ঢুকছে কৃষ্ণা।

কৃষ্ণা বললে, চা আনি !

কিরীটী বললে, হ্যাঁ নিয়ে এস। কিন্তু ডাকনি কেন, এত বেলা হয়ে গেছে !

কৃষ্ণা বললে, তুমি হাত-মুখ ধুয়ে নাও, আমি চা আনি।

সুব্রত উঠেছে ?

কখন ! বিকাশবাবু তো কোন্ সকালেই এসে হাজির—তাঁর সঙ্গে বসে গল্প করছে।

বিকাশ এসেছে ! যাক, নচেৎ আমাকেই যেতে হত তার ওখানে।

কৃষ্ণা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটী হাত-মুখ ধুয়ে বসবার ঘরে এসে যখন ঢুকল, সুব্রত তখন

বিকাশ সেনকে তাদের গত রাত্রের অভিজ্ঞতার কথা বিবৃত করছিল।

কিরীটীকে ঘরে ঢুকতে দেখে বিকাশ বললে, সরকার-বাড়ির সব ঠিকুজিনক্ষত্র যোগাড় করে ফেলেছি, রায়সাহেব।

বসতে বসতে মৃদু হেসে বললে কিরীটী, চা-জলখাবার হয়েছে ?

মিসেস রায় কি বাকি রেখেছেন তা—অনেকক্ষণ হয়ে গেছে।

জংলী ওই সময় ট্রেতে করে তিন কাপ ধুমায়িত চা নিয়ে এসে ঘরে প্রবেশ করল।

চা পান করতে করতে কিরীটী বললে, বল, এবার শোনা যাক, কি সংবাদ সংগ্রহ করলে!

তিন ভাই—,বিকাশ বললে।

তা তো জানি।

শুনেছেন তাহলে ? মেজ ভাইয়ের কোন সন্তানাদি ছিল না। বড় ভাইয়ের দুই ছেলে নীরেন্দ্র, হরেন্দ্র, আর ছোট ভাইয়ের এক ছেলে হীরেন্দ্র।

তা আগেই শুনেছি, কিন্তু হরেন্দ্র এবং নীরেন্দ্র এখন কি করছে ? কি করে তাদের চলে. জানতে পারলে কিছু ?

হীরেন্দ্র অসুস্থ, পক্ষাঘাতে পঙ্গু। কারও সঙ্গে দেখা করে না।

তাও জানি। আর বাকি দুজন ?

ওদের মধ্যে দেখলাম, সদ্ভাব নেই। বিজনেস গুটিয়ে ফেলাবার পর—যদিও একই বাড়িতে থাকে এখনও, ধার-দেনা শোধ করেও যা অবশিষ্ট ছিল, তাও কম নয়। কলকাতার ওপরে খান-দুই বাড়ি। একটা ল্যান্সডাউন মার্কেটের সমানে, অন্যটা শ্যামবাজার অঞ্চলে। নীরেন্দ্র ও হরেন্দ্রর ভাগে শ্যামবাজারের বড় বাড়িটা পড়ল, ছোট বাড়িটা পেল নীরেন্দ্র। নগদ টাকাও ওদের কিছু ছিল, তাও ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গেল।

তারপর ? কিরীটী শুধায়।

নীরেন্দ্র বড় ভাই ওদের মধ্যে, কোনমতে সামলে-সুমলে নিয়ে এখন পুরাতন মোটরের বেচা-কেনার ব্যবসা করে মোটামুটি ভাল ভাবেই চলে যাচ্ছে। হরেন্দ্রর আগে থাকতেই রেস খেলার নেশা ছিল, এখনো আছে। সংসারে স্ত্রী ও দুটি মেয়ে, দুইটিই বিবাহযোগ্য হয়ে উঠেছে। শ্যামবাজারের বাড়ির নীচের তলাটা সে নিয়ে থাকে।

সংসার চলে কি করে তার ? রোজগারপত্তর কি ?

সেটাই আশ্চর্য! কিছুই তেমন করে না—যৎদূর সংবাদ পেয়েছি। তবে বেশ সচ্ছলতার সঙ্গেই চলে যায় বলে মনে হল। কিন্তু বেশি প্রশ্ন করতে পারিনি।

কেন ?

যেমন ষণ্ডাগুণ্ডা মার্কা চেহারা, তেমনি কাঠগোঁয়ার, বদ-মেজাজী। মানে মানে সরে এসেছি।

আর নীরেন্দ্র ?

ভদ্রলোক যথেষ্ট অমায়িক, ভদ্র। বললেন, দেখুন না, বরাতের ফের—কি ছিলাম আর কি হয়েছি। কোন বংশের ছেলে হয়ে আজ পুরনো গাড়ি বেচা-কেনার ব্যবসা করছি।

ওদের মুখে কিছু শুনলে না আর ? ব্যবসাটা গেল কেন ?

হ্যাঁ, ওদের কজন পুরনো কর্মচারীই ওদের পথে বসিয়েছে যোগসাজস করে, চুরি করে একত্রে।

শ্রীমন্ত, শশধর, হারাধন আর শিবানন্দ,—তাও জানি।

হ্যাঁ। ওদের ওপর দেখলাম হরেন্দ্রবাবুর ভীষণ রাগ। পারলে যেন টুঁটি ছিঁড়ে ফেলে।

কিরীটী হেসে বললে, স্বাভাবিক।

॥ নয় ॥

এবার কি কর্তব্য বলুন ?

কথাটা বলে বিকাশ সেন প্রত্যাশাপূর্ণ দৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

কটা দিন অপেক্ষা করতে হবে।

অপেক্ষা করতে হবে ! কেন ?

প্রশ্নটা করে বিকাশ সেন কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

কারণ হত্যাকারী এখন তার চতুর্থ শিকারটিকে খতম করবার প্ল্যান করছে—কিভাবে এবার নীল রুমাল হাতে আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটবে—

কিন্তু—

ভয় নেই বিকাশ, এবারে অত সহজে তাকে কাজ হাসিল করতে দেওয়া হবে না।

সত্যি-সত্যিই দেখা গেল কিরীটী যেন নীল রুমালের দ্বারা হত্যাকাণ্ডগুলির ব্যাপারে একেবারে হাত ধুয়ে বসে আছে। ও যেন ভুলেই গেছে ব্যাপারটা।

দিন দুই পরে আবার সে দু'দিনের জন্য ট্রাঙ্ককল পেয়ে দিল্লী থেকে ঘুরে এল।

আরও দিন দুই পরে।

গত সন্ধ্যা থেকেই অসময়ে আকাশে মেঘ জমে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল, ফলে শীতটাও যেন হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছিল।

কিরীটী গায়ে একটা কম্বল জড়িয়ে আরাম করে বিছানার ওপর বসে-বসেই গরম গরম কফি পান করছিল।

এমন সময় জংলী এসে ঘরে ঢুকল, বাবুজী !

কি রে ?

বিকাশবাবু !

কিরীটী আর মুহূর্ত দেরি করে না। সঙ্গে সঙ্গে কফি শেষ করে কম্বলটা গা থেকে ফেলে উঠে দাঁড়াল। পাশে খাটের বাজু থেকে ড্রেসিং গাউনটা টেনে গায়ে দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে সোজা এসে বসবার ঘরে ঢুকল।

কি খবর বিকাশ—সকাল বেলাতেই—

যা হবার তা হয়ে গেছে মিস্টার রায়। হতাশার সুরে বলে উঠল বিকাশ সেন।

সত্যি !

হ্যাঁ, নীল রুমাল আবার ফাঁস লাগিয়েছে—

কোথায় ?

বালিগঞ্জে বোস অ্যাণ্ড কোং জুয়েলারি শপের প্রোপাইটার—

কে, শিবানন্দ ?

হ্যাঁ, শিবানন্দ বসু। বিকাশ বলে।

আশ্চর্য ! ভাবতে পারিনি, সে এত তাড়াতাড়ি আবার নীল রুমাল হাতে নিয়ে আবির্ভূত হবে। এবারে আমার ক্যালকুলেশনটা দেখছি ভুল হয়ে গেল।

ভুল হয়ে গেল !

হ্যাঁ ভেবেছিলাম, হত্যাকারী এবারে আরও সতর্ক হবে। কিন্তু দেখলাম, হাতের পাঁচ আর সে হাতে রাখতে চায় না।—আগে-ভাগেই দিয়ে প্রোগ্রামটা তার খতম করতে চায়। তা সংবাদটা পেলে কখন ? কার কাছে ?

রথীন তালুকদার তো এখানকার থানার ও. সি সেই-ই আমাকে ঘণ্টাখানেক আগে জানাতেই, সেখানে গিয়ে ব্যাপারটা চাক্ষুষ দেখে, সংবাদটা দিতে আমি ছুটে এসেছি আপনার কাছে।

রথীনবাবু কখন জানতে পারলেন ?

শেষ রাত্রে।

কি করে জানলেন ?

Some unknown person ভোররাত সাড়ে তিনটে নাগাদ তাকে ফোন করে সংবাদটা দেয়—

কি সংবাদ দিয়েছিল ?

Rather interesting। ফোনে তাকে বলে, ও মশাই থানা-অফিসার, ঘুমোচ্ছেন এখনও ? আপনার এলাকায় যে নীল রুমাল ফাঁস পরিয়েছে—বোস অ্যাণ্ড কোং জুয়েলারি শপের প্রোপ্রাইটারকে ! বলেই ফোন কানেকশন কেটে দেয়। বুঝতেই পারছেন, এ শহরের সব থানা অফিসারদের মধ্যে আমাদেরও এ নীল রুমালকে কেন্দ্র করে একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছিল—প্রত্যেকেই যেন আমরা দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম। তাই ফোনটা পাওয়া মাত্রই রথীন কালবিলম্ব না করে তখুনি ছুটে যায়।

তারপর ?

দোকানঘরের কোলাপসিবল গেটে তালা দেওয়া ছিল না, রথীন দুজন কনেস্টেবল নিয়ে সেখানে গিয়ে দেখল, ঘরের ভেতরে আলো জ্বলছিল—

দারোয়ান—কোন দারোয়ান ছিল না ?

না। দোকানে রাত্রে যে দারোয়ানটি পাহারায় থাকত, তার কোন পাত্তাই নেই। পরে অবিশ্যি তাকে মুখ ও হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দোকানের পেছনে একটা ঘরে পড়ে থাকতে দেখা যায়—গোঁ গোঁ করছিল, যাক যা বলছিলাম, দোকানের কোলাপসিবল গেটটায় তালা দেওয়া ছিল না, কেবল টানা ছিল।

রথানবাবু কি করলেন ?

ওই সময় সুব্রত এসে ঘরে ঢুকল।

বিকাশ বলতে থাকে, সে গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকল, ভেতরে আলো জ্বলতে দেখে। দোকানের মধ্যে সব আলোগুলো জ্বলছে। তীব্র চোখ-ঝলসানো আলোতেই চোখে পড়ল, কাউন্টারের সামনেই শিবানন্দ বসুর মৃতদেহটা পড়ে আছে। তার গলায় ফাঁস দেওয়া একটি আকাশ-নীল রঙের রুমাল।

রুমালটা দেখেছেন আপনি ?

হ্যাঁ সেই একই ধরণের রুমাল। এবং রুমালের কোণে ইংরাজী সাঙ্কেতিক অক্ষর '4' লেখা এবারে।

মৃতদেহ এখন কোথায় ?

দোকানেই পড়ে আছে। দোকানে পুলিস-প্রহরা বসানো হয়েছে। রথীন আমার অনেককালের বন্ধু। সেই-ই দোকান থেকে আমাকে ফোন করায় তার থানায় আমি ছুটে গিয়েছিলাম। সেখান থেকেই অপেনার কাছে ছুটে এসেছি সংবাদটা আপনাকে দিতে।

চল, একবার যাওয়া যাক সেখানে।....একটু অপেক্ষা কর বিকাশ, আমি এখুনি আসছি।

কিরীটী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

এবং মিনিট কয়েক পরেই বিকাশের জীপেই কিরীটী ও সুব্রতকে নিয়ে বিকাশ রওনা হল।

গাড়িতে বসে সুব্রত সব শুনল।

দোকানের মধ্যে তখনও রথীন ছিলেন।

তিনি নানা ভাবে দারোয়ানটাকে প্রশ্ন করেছেন তখন, অনেক কষ্টে তার জ্ঞান ফেরানো হয়েছে। বেচারা কেবলই বলছে, দোহাই হুজুরের, সে কিছু জানে না। রাত সোয়া দুটো কি আড়াইটে নাগাদ তার মালিক এসে তাকে ডাকাডাকি করতেই সে ঘুম থেকে উঠে দোকানের গেট খুলে দেয়।

তারপর কি হল, বল ?

আমি দরজা খুলে দিলাম, মালিক দোকানে এসে প্রবেশ করলেন।

তারপর ?

তারপর তাজ্জব কি বাৎ। মালিক সহসা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার মাথায় একটা ভারি ডাণ্ডা দিয়ে আঘাত করতেই আমি পড়ে যাই—জ্ঞান হারাই। তারপর আর কিছু জানি না।

কিরীটী বললে, রথীনবাবু, কিছু চুরি বোধ হয় যায়নি ?

ঠিক বলতে পারছি না, তবে কোন তালা বা আয়রন সেফের তালা তো ভাঙা দেখছি না।

হুঁ। মৃতদেহ কোথায় ?

ওই যে কাউন্টারের পেছনে।

হঠাৎ ওই সময় কিরীটীর নজরে পড়ে কাউন্টারের নিচে কি যেন একটা পড়ে আছে। ঝুঁকে পড়ে জিনিসটা তুলে দেখেই সে চমকে ওঠে। কিন্তু সে কিছু না বলে সবার অলক্ষ্যে সেটা পকেটে রেখে দেয়।

অতঃপর সকলে উঁচু কাউন্টারের পেছনে এগিয়ে গেল।

মৃতদেহটা তখনও উপুড় হয়ে পড়ে আছে। রেশমী রুমালটা কেবল গলা থেকে খুলে নেওয়া হয়েছে। গায়ে একটা শাল জড়ানো, পরনে ধুতি।

কিরীটী মুহূর্তকাল মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে থেকে এগিয়ে গিয়ে আরও সামান্য একটু ঝুঁকে হাত দিয়ে মৃতদেহটা উল্টে দিতেই মৃতদেহটা চিৎ হয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে কিরীটীর মুখ দিয়ে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ বের হয়ে এল এ কি !

কি হল ? একই সঙ্গে রথীন, সুব্রত ও বিকাশ প্রশ্নটা করে।

না, কিছু না। কিরীটী বললে।

সুব্রতও এতক্ষণে চিনতে পারে। কিছুদিন আগে শশধরের মৃত্যুর পরদিন শিবানন্দ বসু পরিচয়ে যে আতঙ্কিত খঞ্জ ভদ্রলোকটি কিরীটীর গৃহে গিয়েছিল, এ সে-লোক নয়।

সুব্রত বলে, তাই তো! এ কে তাহলে?

রথীনের মুখের দিকে তাকিয়ে কিরীটী শুধাল, আর ইউ সিওর রথীনবাবু, ইনিই শিবানন্দ বসু?

নিশ্চয়ই। দারোয়ান সনাক্ত করেছে, শিবানন্দর ছেলে একটু আগে এসেছিল, সেও তো সনাক্ত করে বলে গেছে, এ তারই বাপ। রথীন বললেন।

তবে—,কিরীটী যেন মুহূর্তকাল কি চিন্তা করে। তারপর বলে, রথীনবাবু. এখুনি আমাদের বেরোতে হবে।

কোথায়?

হত্যাকারীকে ধরতে চান তো?

হত্যাকারী! সে কি আর এতক্ষণ ত্রিসীমানায় কোথাও আছে?

ত্রিসীমানায় না থাকলেও মহাশয় ব্যক্তিটি তার নিজস্ব ডেরায় সুস্থ বহাল তবিয়তেই নিশ্চিন্তে বসে বা শুয়ে আছে।

কি বলছেন?

হ্যাঁ, চলুন—আর দেরি নয়। চল বিকাশ।

রথীন জানতেন কিরীটীকে, তার শক্তির কথাও জানতেন—ইতিপূর্বে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের কোন সুযোগ না ঘটলেও। কাজেই তিনি আর দ্বিরুক্তি করেন না। সঙ্গের পুলিস-প্রহরীর জিম্মায় আপাততঃ দোকানঘর ও মৃতদেহ রেখে, বাইরে এসে বিকাশের জীপেই উঠে বসল সকলে।

বিকাশই জীপ চালাচ্ছিল। শুধালে, কোন্ দিকে যাব?

বেলগাছিয়ায়।

বিকাশ বিনা বাক্যব্যয়ে জীপে স্টার্ট দিয়ে এগোতে লাগল।

সকাল নটা বাজে প্রায় তখন।

সুব্রতর কাছে তখনও সমস্ত ব্যাপারটা যেমন ঝাপসা, তেমনি অস্পষ্ট। সেও বুঝতে পারছিল না, কিরীটী কেন বেলগাছিয়ায় চলেছে।

রাস্তায় আর কথা হল না। কেউ জিজ্ঞাসাও করে না, কেন তারা বেলগাছিয়ায় চলেছে!

সকালের দিকে রাস্তায় তখনও তেমন ভিড় জমে ওঠেনি।

বেলা পৌনে দশটা নাগাদ ওরা বেলগাছিয়া ব্রীজ ক্রস করে একটা সরু রাস্তার সামনে এসে গাড়ি থামিয়ে কিরীটীর নির্দেশে সকলে নামল।

সুধীনবাবু, আপনার সঙ্গে পিস্তল আছে?

আছে। সুধীন জবাব দেন।

চলুন।

॥ দশ ॥

সরু রাস্তাটা থেকে সকলে এসে একটা অপ্রশস্ত গলির মধ্যে প্রবেশ করল।

আগে আগে কিরীটী, পশ্চাতে ওরা তিনজন। নিঃশব্দে ওরা তিনজন কিরীটিকে অনুসরণ করে।

একটা তিনতলা বাড়ির সামনে এসে ওরা দাঁড়াল।

বাড়ির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। কলিংবেলটা টিপতেই একজন প্রৌঢ় ভৃত্য এসে দরজা খুলে দিল।

কিন্তু লোকটা চারজনের মধ্যে পুলিসের পোশাক পরা দুজনকে দেখে হঠাৎ যেন কেমন বোবা হয়ে যায়।

তোমার মা বাড়িতে আছেন ?

মা !

হ্যাঁ। আছেন ? কিরীটীই প্রশ্ন করে।

আছেন। লোকটি বলে।

কোথায় ?

দোতলায়। খবর দেব ?

না। আসুন রথীনবাবু। এস বিকাশ। বলে কিরীটীই প্রথমে দোতলার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

ভৃত্যটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। পুলিসের লোক বলে বাধা দিতে সাহস পায় না বোধ হয়।

দোতলায় উঠতেই সামনের ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে যে ভদ্রমহিলা ওদের সামনে এসে দাঁড়াল, বিকাশ ও রথীন তাকে চিনতে পারে।

নমস্কার সঞ্চারিণী দেবী। চিনতে পারছেন! কিরীটীই কথা বলল।

সঞ্চারিণী বিশ্বাসের মুখের ভাবটা হঠাৎ কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, না তো।

চিনতে পারছেন না! কয়েকদিন আগেই তো আপনার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল!

কোথায় বলুন তো ?

বলছি। আপনার 'তিনি'টি নিশ্চয় এখানেই আছেন ?

তিনি!

হ্যাঁ, হীরেন সরকার ?

তিনি এখানে থাকতে যাবেন কেন!

যে কারণে আপনি সেদিন তাঁর ওখানে ছিলেন, সেই কারণেই

হয়ত তিনিও আপনার এখানে। সরে দাঁড়ান, আমরা ঘরে যেতে চাই—

ঘরে যাবেন!

কেন, আপত্তি আছে? কিরীটী শুধোয়।

তা আছে বৈকি। বিনা ওয়ারেণ্টে আমার ঘরে আপনাদের ঢুকতে দেব কেন?

মিথ্যে চেষ্টা করছেন সঞ্চারিণী দেবী। তাকে পালাবার সুযোগ আপনি করে দিতে পারবেন না। কারণ আমি জানি, ওই সিঁড়ি ছাড়া দোতলা থেকে নামবার আর কোন রাস্তা নেই। এ বাড়িটার details আপনাদের থিয়েটারেরই এক অভিনেত্রীর কাছ থেকে পূর্বাহ্ণেই আমার সংগ্রহ করা আছে।

সঞ্চারিণী বিশ্বাস যেন বোবা।

সরে দাঁড়ান।

সঞ্চারিণী সরে দাঁড়াল। সকলে ঘরে প্রবেশ করল।

শয্যার ওপরে কে যেন পেছন ফিরে আগাগোড়া একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।

কিরীটী মুহূর্তকাল দাঁড়াল, তারপরই দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে হাত বাড়িয়ে এক হেঁচকা টান দিয়ে কম্বলটা ফেলে দিতেই যে লোকটি উঠে বসল, সে হীরেন সরকার।

হীরেন সরকার বলে ওঠে, কে আপনারা? এসবের মানে কি?

হীরেনবাবু, নমস্কার। এঁরা দুজন থানা-অফিসার, আর আমাকে আপনার না চেনার কথা নয়—

না, আপনাকে আমি চিনি না—never seen you before in my life!

সুব্রতও অবাক হয়ে হীরেন সরকারের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

কিরীটী আবার ব্যঙ্গভরে বলে ওঠে, চিনতে পারছেন না? আশ্চর্য! আমার বাড়িতে গিয়ে আমার মুখোমুখি বসে শিবানন্দ বোস সেজে অত কথা বলে এলেন, আর এর মধ্যেই সব ভুলে গেলেন? না না, তাও কি হয়!

কি আবোল-তাবোল বকছেন মশাই! আট মাসের ওপর আমি—

আপনি পঙ্গু—শয্যাশায়ী, তাই না? আর তাইতেই বুঝি খোসমেজাজে একবার ল্যান্সডাউনের বাড়িতে আর একবার এখানকার বাড়ীতে যাতায়াত করে থাকেন? শুনুন হীরেনবাবু, আর যার চোখেই ধূলো দিন না কেন, কিরীটী রায়ের চোখে আপনি ধুলো দিতে পারেননি। প্রথম দিনই মোলাকাতের সময় আমার ওখানে আপনার সত্যকার পরিচয়টা আমার চোখের সামনে দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

হীরেন সরকার বোবা।

হ্যাঁ, আপনার হাতের মীনা করা একটা আংটি—ওই যে এখনও আপনার ডান হাতের অনামিকায় রয়েছে, বাংলায় লেখা ওপরে 'হীরেন'—অন্য আংটিগুলো পরার সময় ওটা যদি খুলে রেখে যেতেন! কিন্তু এখন তো বুঝতে পারছেন, পাপ আর গরল চাপা দেওয়া যায় না!

সকলেরই দৃষ্টি গিয়ে পড়ল আংটিটার ওপরে।

সত্যিই আংটিটার ওপরে মীনা করা 'হীরেন' নামটা।

সহসা হীরেনের চোখেমুখে একটা হাসির দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ল। সে কালো কালো এক ঝাঁক দাঁত বের করে বললে, বেশ মেনে নিলাম, আপনার ওখানে শিবানন্দ ছদ্ম-পরিচয়ে আমি গিয়েছিলাম। তা তাতে হয়েছেটা কি?

আর কিছুই হয়নি, কেবল ধরা পড়ে গেছেন।

ধরা পড়ে গেছি !

হ্যাঁ। আপনিই যে শ্রীমন্ত, হারাধন, শশধর ও শিবানন্দের হত্যাকারী—

কি পাগলের মত যা-তা বলছেন ?

পাগল কিনা সেটা আদালতেই প্রমাণ হবে।

বেশ বেশ, তাই না হয় প্রমাণ করবেন। আপনারা আমার অতিথি—বসুন চা খান। সঞ্চারিণী—,বলে উঁচু গলায় ডাক দিল হীরেন সরকার।

সঞ্চারিণী এসে ঘরে ঢুকল।

এঁদের চায়ের ব্যবস্থা কর, এঁরা আমার অতিথি।

এখানে চা পান করতে আমরা আসিনি হীরেনবাবু। উঠুন, আমাদের সঙ্গে এখুনি আপনাকে যেতে হবে। কিরীটী শান্ত কঠিন গলায় বললে।

যাব যাব ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? যেখানে খুশি নিয়ে যেতে চান আমাকে যাব—My misson was over, যে চারজন শয়তান একদিন ষড়যন্ত্র করে আমাদের পথে বসিয়েছিল, তাদের প্রত্যেককে কাটের মত শ্বাসরোধ করে ধ্বংস করেছি।

বিকাশ সেন অবাক হয়ে চেয়েছিল হারেন সরকারের মুখের দিকে।

অবাক বিস্ময়েই শুনছিল যেন ওর প্রতিটি কথা।

লোকটি শয়তান না বদ্ধ উন্মাদ !

হীরেন সরকার অতঃপর উঠে দাঁড়াল। রোগা পাকানো চেহারা।

কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ।

পঙ্গুত্ব কোথাও তার শরীরে নেই।

এখন বুঝতে পারছি, সেদিন আপনার বুদ্ধির দৌড়টা যাচাই

করবার জন্য আপনার সামনে শিবানন্দ পরিচয়ে না গেলেই হয়ত ভাল করতাম কিরীটীবাবু!

সবাই চুপ, কারও মুখে কোন কথা নেই।

হীরেন সরকার বলতে থাকে, আপনার কীর্তিকলাপ ও অত্যাশ্চর্য শক্তির সঙ্গে আমি দীর্ঘদিন পরিচিত মিস্টার রায়। চাক্ষুষ ও সাক্ষাৎ আমাদের মধ্যে পরস্পরের পরিচয়ের সৌভাগ্য না ঘটলেও, আপনার কথা শুনে শুনে মনে হত কি জানেন?

কি?

পড়তেন আপনি মুখোমুখি সেরকম একজনের পাল্লায়, বোঝা যেত সত্যিকারের আপনার বুদ্ধির ক্ষুরধারটা—যাচাই হয়ে যেত হাতে হাতে ব্যাপারটা। আর তাই ওই চার-চার বিশ্বাসঘাতক শয়তানের ধ্বংসযজ্ঞে নেমে পর পর তিনজনকে হত্যা করবার পরও যখন দেখলাম আপনার টনক নড়ল না, আর স্থির থাকতে পারলাম না।

নিজেই গেলেন আমার কাছে?

হ্যাঁ।

এবং সেটাই হয়ে দাঁড়াল আপনার জীবনের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ভুল।

তা হয়ত হয়েছে। তবু জানি, আপনি ছাড়া বোধ হয় দুনিয়ার কারও সাধ্য ছিল না আমাকে ধরে। ধরা পড়েছি বলে আমার কোন দুঃখ নেই মিস্টার রায়, আমার প্রতিজ্ঞা আমি পূর্ণ করেছি। I have done my duty!

কিন্তু এ কাজ কেন করতে গেলেন হীরেনবাবু? কেন যেন কিরীটীর মনের মধ্যে হীরেনের প্রতি একটা মমতা জাগে।

কেন করতে গেলাম!

হ্যাঁ। আইন ছিল দেশে, আইনের আশ্রয় নিলেই তো পারতেন।

কিছু হত না তাতে করে। আইনের সাধ্য ছিল না ওই পাষণ্ডদের কেশ স্পর্শ করে। ওই ধূর্ত শয়তান শৃগালের দলকে ধরা যেত না হাতেনাতে। তাই ওই পথটাই আমি বেছে নিয়েছিলাম।

তারপর একটু কেসে বললে হীরেন সরকার, কিন্তু আপনি সত্যি বলুন তো, আমাকে সন্দেহ করলেন কি করে?

যে মুহূর্তে জানতে পেরেছিলাম, ওরা চারজনই আপনাদের পূর্বতন কর্মচারী ছিল এবং ওদেরই জন্য আপনাদের ব্যবসায় ভরাডুবি হয়েছিল, তখুনি—

কি?

ওদের হত্যার মোটিভটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। তবে—

তবে?

মোটিভটা খুজে পেলেও তখনও স্থিরনিশ্চিত হতে পারিনি, আপনাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে কে এ কাজ করেছেন! কিন্তু আপনার আমার গৃহে আসা ও তারপর আপনার হত্যাকাণ্ড শুরু হওয়ার আট মাস আগে থাকতে পঙ্গু বনে যাবার ইতিহাস, আপনার অভিনয়-ক্ষমতা সব মিলিয়ে আপনার উপরেই আমার সন্দেহটা পড়ে।

কেবল কি তাই?

আরও আছে।

কি?

সংবাদপত্র 'প্রত্যহে' প্রকাশিত ধারাবাহিক বিজ্ঞাপনটাও আমার চোখের দৃষ্টি খুলে দিয়েছিল। আর শেষ মোক্ষম প্রমাণ—

কি?

পকেট থেকে কিরীটী সোনার একটা সিগারেট কেস বের করল। এই সোনার সিগারেট কেসটা। এটা শিবানন্দর দোকানের

শো-কেসের তলায় পড়ে থাকতে আমার নজর পড়ায় সবার অলক্ষ্যে তুলে নিতেই আর মনে সন্দেহের অবকাশ মাত্রও রইল না আমার।

—চিনতে পারছেন এটা ?

হীরেন সরকার হেসে হাত বাড়াল—নিশ্চয়ই। দিন ওটা।

উঁহু, এটা আদালতের property এখন—

দেবেন না ?

না।

৪

ইউসুফ মিঞাকে আমি অনেক দিন থেকেই চিনি।

বয়স পঞ্চাশের উর্ধ্বে, পাঁকাটির মত সরু লম্বা চেহারা। দেহের কোথাও মাংস বলে কোন পদার্থ আছে বলে মনে হত না ওকে দেখলে। কেবল যেন কতকগুলো হাড়, তার উপরে চামড়া। ছোট ছোট করে ছাঁটা কাঁচাপাকা দাড়ি। মধ্যে মধ্যে মেহেদীতে সে তার সেই দাড়ি রাঙিয়ে নিত। পরনে একটা চেককাটা লুঙ্গি, গায়ে হাফহাতা পাঞ্জাবির মত একটা জামা ; ঐ ছিল তার পোশাক।

টেরিটিবাজারে ওর একটা দোকান ছিল চিড়িয়ার। নানা ধরনের দুষ্প্রাপ্য পাখী কেনাবেচা করত ইউসুফ মিঞা। ও পাখী বলত না। বলত, চিড়িয়া।

চিড়িয়ার জাত চিনতে ইউসুফ মিঞা ছিল অদ্বিতীয়। সামান্যক্ষণ পাখীটাকে পর্যবেক্ষণ করেই বলে দিতে পারত ইউসুফ, কোন্ জাতের কোথাকার পাখী আর তার কিম্মত কত হতে পারে বা হওয়া উচিত।

বাজারে ঢুকতেই বাঁ-হাতি দুটো ঘরে তার দোকান ছিল। সামনের ঘরটার পিছনে আর একটা মাঝারি সাইজের ঘর ভর্তি নানা ধরনের ছোট বড় মাঝারি খাঁচায় নানা ধরনের পাখী। সর্বক্ষণই কিচিরমিচির শব্দ করছে বা শিস দিচ্ছে কিংবা মধুর শব্দে ডেকে ডেকে উঠছে।

একপাশে একটা চৌকি পাতা। সেই চৌকির উপরেই বসে থাকত ইউসুফ মিঞা সারাটা দিন। সামনে থাকত তার টাকা-পয়সার ক্যাশ বাক্সটা। রাত্রে ঐ চৌকিটার উপরেই শুয়ে ঘুমাত, দোকানের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ভিতর থেকে।

পিছনদিকে ঘর দুটোর একটা সরু ফালি বারান্দা মত—তাও প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। তার একদিকে রান্নার ব্যবস্থা, অন্যদিকে কলপায়খানার ব্যবস্থা।

মোটমাট সামনের দরজা বন্ধ করে দিলে ঐ ঘর দুটির মধ্যে কোন দিক দিয়ে আর কোন রাস্তা ছিল না।

ইউসুফ মিঞা চট্টগ্রামের লোক—তবে ব্যবসার খাতিরে কলকাতার টেরিটিবাজারে এসে ঐ ঘর দুটিতে আস্তানা গাড়বার পর থেকে দেশ চট্টগ্রামের সঙ্গে আর কোন সম্পর্কই ছিল না দীর্ঘ অনেকগুলো বৎসর।

ইউসুফ মিঞার বিবি ছিল না, অনেক কাল আগেই গত হয়েছিল। ছিল একটি ছেলে—সুলতান। সুলতানের বয়েস বছর আঠারো-উনিশ এবং সেও তার শৈশব থেকে তার আব্বাজানের সঙ্গে থেকে চিড়িয়ার কারবার করতে করতে চিড়িয়া সম্পর্কে বেশ ওয়াকিবহাল হয়ে উঠেছিল।

বাপের মত ছেলে রোগা-শুঁটকো নয়। বেশ তাগড়াই জোয়ান।

অনেক বছর আগে কিরীটীর একবার কাকাতুয়া পোষবার শখ জেগেছিল মনে এবং একটি বেশ ভাল কাকাতুয়ার সন্ধান করছে জেনে আমিই তাকে সেদিন টেরিটিবাজারে ইউসুফ মিঞার দোকানে নিয়ে গিয়েছিলাম।

কিরীটীর পরিচয় দিয়ে বলেছিলাম আমি, বাবুকে একটা ভাল কাকাতুয়া দিতে পার ইউসুফ মিঞা ?

কেন পারব না আজ্ঞে—একটা ভাল কাকাতুয়ার বাচ্চাই আছে আমার কাছে—অস্ট্রেলিয়া থেকে আনা—তার দামটা একটু বেশি পড়বে বাবু।

কিরীটী তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারপাশে ঘরভর্তি রাখা নানা

ধরনের রঙবেরঙের বিচিত্র সব পাখী ও তাদের বিচিত্র কলকাকলী শুনছিল।

দামের জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না মিঞা। কোথায় তোমায় কাকাতুয়া দেখাও। বললাম আমি।

দাঁড়ান, দেখাচ্ছি। উঠে দাঁড়াল ইউসুফ মিঞা।

পিছনের ঘর থেকে ইউসুফ একটি খাঁচা নিয়ে এল।

খাঁচার মধ্যে নীলচে সাদা রঙের কাকাতুয়ার বাচ্চা। ভাল করে এখনও শরীরে রোঁয়া গজায়নি। মানুষের মত এ কাকাতুয়া কথা তো বলবেই, তাছাড়া সর্বক্ষণ জেগে পাহারাও দেয়—ইউসুফ মিঞা বলে।

কিরীটী কথাটা বিশ্বাস করেনি অবশ্য সেদিন। মৃদু হেসেছিল।

বাবু হাসছেন! ঠিক আছে, মাস পাঁচ-ছয়ের মধ্যে যা বললাম তা যদি না হয় তো ইউসুফ মিঞার চিড়িয়া ফিরিয়ে দিয়ে যাবেন—দাম আমি ফেরত দিয়ে দেব। ইউসুফ মিঞা বলে।

জিজ্ঞাসা করলাম, তা কত চাও?

আজ্ঞে আটশো টাকা।

বল কি মিঞা!

আজ্ঞে যেমন চিড়িয়া তার দামও তেমনি।

আশ্চর্য! কিরীটী কিন্তু অতঃপর কোন দরদাম করেনি।

বলেছিল কেবল, সঙ্গে অত টাকা নেই, পরের দিন এসে কাকাতুয়াটা নিয়ে যাবে। শ'খানেক টাকা অ্যাডভান্স রেখে চলে এসেছিল।

বলা বাহুল্য পরের দিনই গিয়ে সেই কাকাতুয়াটা কিনে এনেছিল কিরীটী! এবং ইউসুফ মিঞা যে মিথ্যা বলেনি মাস চারেকের মধ্যেই সেটা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল।

সে কিরীটীকে কিরীটী এবং কৃষ্ণাকে কৃষ্ণা বলে ডাকত।

আমাকে দেখলেই বলে উঠত, সুব্রত এসেছে কিরীটী, সুব্রত এসেছে।

কৃষ্ণা হাসত। কিরীটী হাসত।

কিন্তু জংলী ক্ষেপে যেত যখন কাকাতুয়াটা চেঁচাতে শুরু করত, এই জংলী, বাবুকে চা দে, আমাকে জল দে। এই জংলী—জংলী! ভূত!

কৃষ্ণার জংলীর প্রতি সম্ভাষণটাকে চালাত।

কে বলবে একটা পাখী—ঠিক যেন একটা মানুষ কথা বলছে! কথাও স্পষ্ট।

পাখীটা কিন্তু বেশী দিন বাঁচেনি।

বছর দুই বাদে হঠাৎ কি হল—হঠাৎ মরে গেল এক সন্ধ্যায় পাখীটা।

দুটো দিন কিরীটী কেমন যেন গুম হয়ে রইল। মনে খুব লেগেছিল পাখীটার মৃত্যু কিরীটীর। খবর পেয়ে আমি গেলাম। বললাম, এর জন্য এত মুষড়ে পড়েছিস! চল্, ইউসুফের কাছ থেকে আর একটা কাকাতুয়া যোগাড় করে নিয়ে আসি।

এ যেন গাছের ফল, আঁকশি দিয়ে টানলেই হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়বে! ইউসুফ সত্যিই বলেছিল—এ পাখীর তুলনা নেই! কিরীটী বলে।

তা বলে তেমনটি আর মিলবেই না, তারই বা কি মানে আছে? চল্, ওঠ্।

গেলাম ইউসুফের ওখানে।

ইউসুফ ছিল। সব শুনে বললে, ও চিড়িয়া তো চট্ করে মেলে না বাবু। একটিই ছিল, আপনাকে দিয়েছিলাম। এখন কোথায় পাব?

আনিয়ে দিতে পার না একটা?

যে এনেছিল সে একজন জাহাজের খালাসী। তার জাহাজ অস্ট্রেলিয়ায় গেলে ওই রকম কাকাতুয়া সে এনেছে বার দুই।

সে আর আসবে না ?

চিড়িয়া পেলেই আসবে। প্রায় বছরখানেক সে আসে না।

এক বছরের মধ্যে আর আসেনি সে ?

না, তার জাহাজ তো এদিকে বড় একটা আসে না। মধ্যে মধ্যে কখনও আসে। একজন গোয়ানিজ—ডি'সিলভা নাম তার।

হতাশ হয়েই অতঃপর আমাদের ফিরে আসতে হয়েছিল।

অথ কাহিনীর উপক্রমণিকা বা মুখবন্ধ। অতঃপর দেড় বৎসরাধিকাল পরে যে কাহিনীর যবনিকা উত্তোলন করতে চলেছি তার সঙ্গে ঐ ইউসুফ মিঞার নামটা জড়িয়ে গিয়েছিল।

॥ দুই ॥

সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদ সহসা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সংক্ষিপ্ত সমাচার : টেরিটিবাজারে নৃশংস খুন। টেরিটিবাজারের এক পাখীওয়ালা ইউসুফ মিঞাকে তার ঘরের মধ্যে গলাকাটা মৃতাবস্থায় রক্তাপ্লুত পাওয়া গিয়াছে।

বর্ষাকাল—এবারে বৃষ্টি বা মনসুন শুরু হয়েছে শ্রাবণের একেবারে শেষে। গতকাল বিকেল থেকে শহরে প্রবল বর্ষণ চলেছে একটানা প্রায় বলতে গেলে।

রাস্তাঘাট প্রায় জলমগ্ন। বৃষ্টি একবার সামান্যক্ষণের জন্য ধরে, আবার প্রবল বর্ষণ শুরু হয়। বিকেলে গতকাল এসেছিলাম কিরীটীর ওখানে কিন্তু গৃহে ফেরা হয়নি প্রবল বর্ষণের জন্য।

সকালবেলা তখনও আকাশটা যেন শ্লেটের মত ধূসর ও ভারি হয়ে আছে। থেকে থেকে বর্ষণ হচ্ছে। কিরীটীর বসবার ঘরে আমি,

কিরীটী ও কৃষ্ণা চা পান করছিলাম। আমার হাতে ঐদিনকার সংবাদপত্রটা।

সহসা পাতা ওলটাতে ওলটাতে সংবাদটি আমার চোখে পড়ল।

চমকে উঠলাম।

এ কি!

কি হল? কিরীটী আমার মুখের দিকে তাকাল।

ইউসুফকে কে যেন নৃশংসভাবে খুন করে গিয়েছে।

ইউসুফ!

হ্যাঁ রে। সেই টেরিটিবাজারের চিড়িয়াওয়ালা—ইউসুফ মিঞা।

কি লিখেছে?

গতকাল সকালে তার দোকানঘরের মধ্যে তাকে রক্তাক্ত গলাকাটা মৃত পাওয়া গিয়েছে

তার একটা ছেলে ছিল না—কি যেন নাম? কিরীটী মৃদু-কণ্ঠে বললে।

সুলতান।

সুলতান ছিল না বুঝি ঐ সময়? সেও তো বাপের কাছেই থাকত?

সে-রাত্রে সে দোকানে ছিল না। বরাহনগরে তার এক বন্ধুর ওখানে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিল। ভোররাত্রে গিয়ে দেখে দোকানের দরজাটা ভেজানো। দরজা ঠেলে খুলতেই একরাশ পাখী চারদিক থেকে চারপাশে ডেকে ডেকে উড়তে থাকে। ঘরের আলোটা নেভানো ছিল।

থতমত খেয়ে প্রথমটায় ব্যাপারটা না বুঝতে পেরে সে অন্ধকারে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। তারপর এগুতে গিয়ে পায়ে কি বেধে গিয়ে মেঝের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তারপর কোনমতে উঠে আলো জ্বালতেই চোখে পড়ে তার, বাপজান মেঝের উপর পড়ে আছে

রক্তাপ্লুত অবস্থায়। তার গলাটা কাটা। সে তখুনি চিৎকার করে আশপাশের সকলকে ডাকে। অতঃপর পুলিস আসে। কাউকে এখনও গ্রেপ্তার করা হয়নি।

কিরীটী সংবাদটা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর বলে, লোকটা তো যতদূর মনে পড়ে বেশ নিরীহ শান্তশিষ্ট টাইপের ছিল।

তাই তো ভাবছি, অমন একটা লোককে কে খুন করতে পারে? আর কেনই বা করল অমন করে?

কথা আমার শেষ হল না, জংলী এসে ঘরে ঢুকল, বাবু!

কি রে?

একটা লোক দেখা করতে চায়।

এত সকালে বৃষ্টি মাথায় করে আবার কে এল? বললাম আমি।

কিরীটী বলে, কি চায়? কোথা থেকে আসছে?

আজ্ঞে বললে, বিশেষ দরকার নাকি আছে আপনার সঙ্গে।

যা, কোথা থেকে আসছে, কি নাম—জিজ্ঞাসা করে আয়।

আজ্ঞে বললে, টেরিটিবাজার থেকে আসছে।

টেরিটিবাজার! চমকে উঠি।

হ্যাঁ—ইউসুফ মিঞার ছেলে সুলতান।

যা, এই ঘরে নিয়ে আয়। কিরীটী সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দেয়।

জংলী চলে গেল।

একটু পরেই জংলীর পিছনে পিছনে যে যুবকটি এসে ঘরে ঢুকল তার বয়স বাইশ তেইশের মধ্যে।

যুবকটি সুলতানই। বেশ কয়েক বছর পরে হলেও তাকে আমাদের কারোর চিনতে কষ্ট হয় না, কারণ বার-দুই ওকে ইউসুফের দোকানে দেখেছিলাম, তবে অন্য বেশভূষায়। তখন পরনে ছিল চেককাটা এক লুঙ্গি আর সাদা ময়লা পাঞ্জাবি। চুলের বাহারও বিশেষ ছিল না সে-সময়।

সাদামাটা চেহারা ও বেশ। আজ চেহারা ও বেশভূষায় অনেক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হল। মাথায় টেরি, কেয়ারী করে ছাঁটা চুল ও ঠোঁটের উপরে বাটারফ্লাই গোঁফ, মেহদী রাঙানো সুর দাড়ি। রংটা মাজা-মাজা। পেশল বলিষ্ঠ দেহের গড়ন। পরনে পায়জামা ও লক্ষ্ণৌ চিকনের পাঞ্জাবি।

চিড়িয়াওয়ালা ইউসুফ মিঞার বেটা বলে আজ যেন চিনবারই উপায় নেই সুলতানকে। যেন কোন খানদানী মুসলমানের ঘরের ছেলে। শৌখীন চেহারায় ও বেশভূষায়।

বাবুজী, আপনারা দুজনেই আছেন ভালই হল, সেলামালেকুম বাবুজী। আমাকে চিনতে পারছেন ?

কিরীটী বললে, বস সুলতান।

কিরীটীর আহ্বানে কোনরকম সংকোচ না করে পায়ের জুতো খুলে ঘরের পুরু দামী কার্পেট মাড়িয়ে এসে একটা সোফার উপর আমাদের মুখোমুখি বসল, আপনারা যে গরীবকে চিনতে পারবেন বুঝিনি। বাবুজী, একটা বিশেষ কারণে আপনার কাছে এসেছি। সুলতান কিরীটীর মুখের দিকেই তাকিয়ে বলে কথাটা।

খবরের কাগজে একটু আগেই পড়ছিলাম, তোমার আব্বাজান—

হ্যাঁ বাবুজী, আমার আব্বাজানকে পরশু রাত্রে আমার অবর্তমানে কারা যেন শেষ করে রেখে গিয়েছে।

তুমি ছিলে না ?

না বাবুজী, বরাহনগরে এক দোস্তের ওখানে গিয়েছিলাম। খানাপিনা শেষ হতে হতে অনেক রাত হল, তারপর কোন বাস বা গাড়ি পেলাম না, হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এসেছি।

কত রাতে পৌঁচেছিলে ?

রওনা হয়ে ছিলামই তো রাত তিনটের পর, পৌঁছাতে পৌঁছাতে সেই প্রায় সাড়ে চারটে। আশেপাশে কোন জনমনিষ্যি নেই,

দরজা ঠেলে আব্বাজানকে ডাকতে যাব, হঠাৎ দেখি দরজা খুলে গেল—হাতের ঠেকা লেগেই।

তারপর? আমিই শুধালুম।

চমকে গিয়েছিলাম। আব্বাজান তো কখনো দরজা খুলে শোয় না, খুব সতর্ক মানুষ! শোবার আগে দরজা ঠিক বন্ধ হল কিনা ভাল করে পরীক্ষা না করে কখনো শুতে যায় না। সেই মানুষ দরজা খুলে রেখেছে—কেমন যেন খট্‌কা লাগল।

দরজা খুলে যেতে প্রথমে তোমার চোখে কি পড়েছিল সুলতান? প্রশ্ন করে কিরীটীই এবারে।

অন্ধকার—পাখার ঝটপট শব্দ। মনে হল যেন অন্ধকার ঘরটার মধ্যে সব পাখীগুলো খাঁচা থেকে বের হয়ে পাখা ঝাপটাচ্ছে। প্রথমটায় কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিলাম; অন্ধকারেই বোধ হয় কয়েক পা এগিয়েছিলাম, হঠাৎ বাধা পেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম অন্ধকারে।

কিসে বাধা পেলে?

তখন বুঝতে পারিনি, পকেটে টর্চ ছিল না, তাই কোনমতে অন্ধকারেই উঠে দাঁড়িয়ে হাতড়ে হাতড়ে ঘরের দেওয়ালে আলোর সুইচটা টিপে দিতেই সব কিছু নজরে পড়ল। মেঝের উপর রক্তাক্ত অবস্থায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে আমার আব্বাজান, ঘরের মেঝেতে চাপ-চাপ রক্ত আর ঘরের সব পাখীর খাঁচার দরজাই বলতে গেলে খোলা। উড়ছে, বসছে, ডানা ঝাপটাচ্ছে—সব যেন ওলটপালট তছনছ। কিন্তু সে-সব কিছু দেখবারও আমার সময় হয়নি। ছুটে গিয়ে আব্বাজানের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে চেঁচিয়ে উঠলাম আব্বাজান! আব্বাজান!

সে সময় নজরে পড়ল আব্বাজানের গলাটা একেবারে দু-ফাঁক করে কাটা।

তারপর—তুমি কি করলে সুলতান ?

আমার চেঁচামেচিতে আশপাশের দোকান থেকে সবাই ছুটে এল। তারাই তখন পুলিসে খবর দেয়। পুলিশ এল, সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করল, কিন্তু কেউ কোন হদিস দিতে পারল না। কেউ কিছুই বলতে পারল না। কেউ কিছুই নাকি জানে না। জানতেও পারেনি।

সুলতানের মুখে সব কথা শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল কিরীটী।

তারপর একসময় প্রশ্ন করল, কিন্তু তুমি আমাদের কাছে এসেছ কেন ?

বাবুজী, আমার আব্বাজানের কাছেই আপনার কথা শুনেছিলাম। আপনি খুব বড় একজন গোয়েন্দা, আব্বাজানই একদিন আমাকে বলেছিল। হঠাৎ কালে রাত্রে আপনাদের কথা আমার মনে পড়ল বাবুজী। কালই আসতাম, কিন্তু বৃষ্টির জন্য আসতে পারিনি। জানি না আমার আব্বাজানকে অমন করে কে খুন করেছে। কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত সে কথা জানতে পারছি আমার মনের দুঃখ যাবে না। কেবলই মনে হচ্ছে সে-রাতে যদি আমি বরাহনগরে না যেতাম তবে হয়ত ঐ ঘটনা ঘটত না। আমার আব্বাজানকে অমন করে প্রাণ দিতে হত না। মনে হচ্ছে তাই আমিই দায়ী—আমার আব্বাজানের মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। বলতে বলতে গলাটা যেন কান্নায় বুজে এল সুলতানের।

চোখের কোল বেয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল ?

একটু থেমে হাতের পাতায় চোখের অশ্রু মুছে সুলতান বললে জানেন বাবুজী, আব্বাজান সেদিন সন্ধ্যায় আমাকে যেতে দিতে চায়নি—বলেছিল আজ বরাহনগরে নাই গেলি বেটা, কিন্তু শুনিনি তার কথা। দোস্ত মুকুন্দ নিমন্ত্রণ করেছে—অনেককালের দোস্তি

আমাদের—আছাড়া অনেকদিন দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না—তাই আব্বাজানের কথায় কান দিইনি।

সুলতানের দু চোখের কোল আবার অশ্রুতে ভরে ওঠে।

বাইরে আবার বৃষ্টি নামল বেশ জোরে।

বাবুজী, আপনার যোগ্য পারিশ্রমিক হয়ত আমি দিতে পারবো না—তবে সাধ্যমত দেবো—কিছু টাকা আমি সঙ্গেই এনেছি। বলে একশো টাকার খান তিনেক নোট জামার পকেট থেকে বের করল সুলতান।

টাকা তুমি রাখ সুলতান। কিরীটী বললে।

বাবুজী আপনি কি তাহলে আমাকে কৃপা করবেন না!

আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব তোমার আব্বাজানের হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে। আমার পারিশ্রমিকের জন্য তুমি ভেবো না, আগে কাজটা হোক তারপর যা খুশি তুমি তোমার দিও।

বাবুজী।

এখন কয়েকটা প্রশ্নের আমার জবাব দাও সুলতান।

বলুন?

তোমাদের কি কোন দুশমন বা শত্রু ছিল?

দুশমন!

হ্যাঁ, তোমার বা তোমার আব্বাজানের?

আমরা ঐখানে আজ বিশ সালেরও উপরে আছি। আব্বাজানকে সবাই ওখানে খুব ভালবাসত—কারণ দায়ে-আদায়ে আব্বাজান সকলকেই অর্থ বা তাগদ দিয়ে সাহায্য করত। আমার সঙ্গে অবিশ্যি কখনও কখনও ঝগড়াঝাঁটি—মারামারিও হয়েছে, কিন্তু—

আচ্ছা ঐ ব্যবসায় তোমাদের লাভ হত কি রকম সুলতান?

মিথ্যে বলব না বাবুজী, আব্বাজান ঐ ব্যবসা করে বেশ কিছু জমিয়েছিল।

কত টাকা হবে ?

তা দশ-বারো হাজার তো হবেই।

সে টাকা কোথায় সে রাখত ?

ঘরে একটা হাঁড়ির মধ্যে।

সে টাকাগুলো আছে তো ?

হাঁড়িটা যেমন ছিল তেমনিই আছে, সে আমি ঐ দিনই দেখেছি।

তাহলে টাকার জন্য নয় !

কি বললেন বাবুজী ?

না। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে সুলতান, কেউ টাকা-পয়সার লোভে তোমার আব্বাজানকে খুন করেনি। আচ্ছা সুলতান !

বলুন বাবুজী ?

॥ তিন ॥

কিরীটী একটু থেমে বলে, কাউকে তুমি সন্দেহ কর, যে তোমার আব্বাজানকে খুন করতে পারে ?

আমার মাথার মধ্যে তো কিছুই আসছে না বাবুজী, অমন নিষ্ঠুরভাবে কেউ আব্বাজনেকে হত্যা করতে পারে !

আচ্ছা সুলতান ?

বলুন বাবুজী।

পাখী কিনতে তো অনেকেই আসত তোমাদের কাছে ?

তা আসত। অনেক সময় অনেক বড় বড় রহিস আদমীও আমাদের ঐ দোকানে পাখীর খোঁজে এসেছে।

গত সাতদিনের মধ্যে বা ধর দিন দশ-পনেরোর মধ্যে এমন কোন বিশেষ খরিদ্দার তোমাদের দোকানে এসেছিল কি, মানে

আমি বলতে চাই সাধারণ পাখীর খদ্দের নয়, কোন দামী পাখী যা হয়ত এদেশে চট্ করে পাওয়া যায় না ?

তেমনি তো কই কিছু মনে পড়ছে না বাবুজী।

সব সময়ই কি তুমি দোকানে থাকতে ?

না তা থাকতাম না বটে। আব্বাজানই সব সময় থাকত দোকানে। দোকান ছেড়ে কখনও আব্বাজান ইদানীং কোথায়ও যেত না।

হয়ত তুমি যখন ছিলে না, তখন আসতে পারে ?

তা পারে হয়ত। ভাল কথা, মনে হচ্ছে কথাটা আপনার জানা উচিত।

কি কথা বল তো ?

দিন পনের-ষোল আগের ব্যাপার। ডি'সিলভার সঙ্গে একটা লোক সিঙ্গাপুরী ময়না নিয়ে এসেছিল। ঐ ধরনের ময়না আট-দশ বছরে হয়ত একটা-আধটা আসে।

সিঙ্গাপুরী ময়না ?

হ্যাঁ। দেখতে ভারি সুন্দর। কালো কুচকুচে—ঠোঁটটা ঠিক সাধারণ ময়নার মত হলদে নয়, হলদে আর সাদায় মেশানো, অনেকটা ফিকে সোনার মত রং, চোখ দুটো লাল। ঐ পাখীকে সেখালে সে যে কেবল মানুষের মত শেখানো বুলিই কপচায় তা নয়, মানুষের মত যা আপনি জিজ্ঞাসা করবেন তার সম্পর্কে, সব বলবে। মনিব যদি বেরুবার সময় কোথায় সে যাচ্ছে এবং কখন ফিরবে বলে যায়—কেউ এসে মনিব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে ঠিক বলে দেবে। অথচ না জানা থাকলে অন্য ময়না থেকে চট্ করে ঐ ময়নার পার্থক্য বোঝা যায় না।

ভারি আশ্চর্য তো ?

হ্যাঁ বাবুজী, ঐ পাখীর তুলনা নেই। দামও তেমনি।

কি রকম দাম ?

দু হাজার তো বটেই—

বল কি সুলতান ! একটা পাখীর দাম দু হাজার ?

অমন চিজ তার দাম হবে না ! লক্ষ্ণৌর এক নবাবের ঐরকম একটা পাখী ছিল। নবাব মরবার পর সে পাখীটা চার হাজার টাকায় বিক্রি হয়ে ছিল।

সেই রকম একটা ময়না এসেছিল তোমাদের দোকানে ?

হ্যাঁ, ডি'সিলভার-সঙ্গের লোকটি অমনি একটি ময়না এনেছিল।

ইউসুফ কিনেছিল ময়নাটা ?

হ্যাঁ।

কতোয় ?

হাজার টাকায়।

তারপর ?

যে লোকটি ডি'সিলভার সঙ্গে এসেছিল ঐ ময়না নিয়ে, সে কিন্তু ঐ ময়নার গুণাগুণ জানত না ডি'সিলভাও সঠিক জানত মনে হয় না। তবে ডি'সিলভা আব্বাজানের সঙ্গে ব্যবসা করে করে রীতি-মত চালাক হয়ে উঠেছিল—আব্বাজানের মুখের হাবভাব দেখেই চিড়িয়ার দাম সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করে নিত। তারপর দরদস্তুর শুরু করত। ঐভাবে দামদস্তুর করতে করতেই আঁচ করে নিলে ডি'সিলভা চিড়িয়াটা দামী না সাধারণ চিড়িয়া একটা।

তারপর ?

চিড়িয়া চিনতে আব্বাজানের জুরি এ শহরে ছিল না। আব্বাজানের মুখে শুনেছি প্রথম যৌবনে আব্বাজান লক্ষ্ণৌর এক সাহেবের কাছে চাকরি করত। তাঁর ছিল চিড়িয়া পোষার শখ। দেশ-বিদেশ ঘুরে ঘুরে নানা ধরনের চিড়িয়া এনে নিজের বাড়ির বাগানে বিরাট বিরাট খাঁচা তৈরী করে তার মধ্যে জড়ো করেছিলেন। সাহেবের

যে চিড়িয়া পোষারই শখ ছিল তাই নয়, চিড়িয়া চিনতেও তাঁর জুড়ি দ্বিতীয় কেউ ছিল না। চিড়িয়া দেখেই তিনি বলে দিতে পারতেন কি জাতের কোন দেশের চিড়িয়া সেটা, তার কি গুণাগুণ। দীর্ঘ ছয় বছর তাঁর কাছ থেকে আব্বাজান চিড়িয়া সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছিল। পরে কলকাতা শহরে এসে চিড়িয়ার ব্যবসা শুরু করে।

কিন্তু সেই সিঙ্গাপুরী ময়নাটার কথা তুমি কি বলছিলে সুলতান? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

সুলতান আবার বলতে শুরু করে, সেই লোকটা চিড়িয়া বেচে চলে গেলে আব্বাজানকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, অত দাম দিয়ে ঐ ময়নাটা কিনলে কেন? আব্বাজান বললে, যে দামে কিনেছি তার তিনগুণ দামে চিড়িয়াটা বিক্রি হবে বেটা। তুই বরং এক কাজ কর্, রায় সাহেবকে একটা খবর দিয়ে আয়।

মানে আমাকে!

হ্যাঁ, কিন্তু আসি-আসি করতে করতে আমার আসা হয়নি আপনার কাছে। ইতিমধ্যে একটা ব্যাপার ঘটেছিল—

কি?

চিড়িয়াটা কেনবার ঠিক দিন সাতেক পরে এক সন্ধ্যায় বিরাট একটা গাড়িতে চেপে একজন স্যুটপরা ভদ্রলোক আমাদের দোকানের সামনে এসে গাড়ি থেকে নামল। সে এসেই সেই চিড়িয়াটার খোঁজ করল। আব্বাজান বললে, আছে, কিন্তু দাম তিন হাজার টাকা পড়বে।

তারপর?

লোকটি চিড়িয়াটা দেখতে চাইল, আব্বাজান দেখাল, আর আশ্চর্য, খাঁচা সমেত চিড়িয়াটা তার সামনে এনে রাখতেই, চিড়িয়াটা হঠাৎ বলে উঠল, রবিন রবিন রবিন! আব্বাজান তখন শুধায় লোকটিকে, চিড়িয়াটা কি আপনার চেনা? আপনার নাম কি রবিন?

লোকটি কি জবাব দিল ?

বললে, না না, ওই চিড়িয়া আমি আগে কখনও দেখিইনি, তাছাড়া আমার নামও রবিন নয়। আব্বাজান আর কোন কথা বলে না। লোকটা দর-কষাকষি শুরু করল এবং শেষ পর্যন্ত দরে না পোষাতে লোকটা চলে গেল।

কত টাকা দিতে চেয়েছিল লোকটা ?

দু হাজার পর্যন্ত দিতে চেয়েছিল।

হুঁ। তারপর আর সে আসেনি ?

না।

পাখীটা এখনও তাহলে বিক্রী হয়নি ?

না। তবে—

কি ?

সে রাত্রে আবার যখন একে একে চিড়িয়াগুলোকে খাঁচায় ভরলাম—সেই ময়নাটাকে কিন্তু দেখতে পেলাম না।

সে পাখীটা নেই ?

না।

পুলিসকে কথাটা তুমি জানিয়েছিলে সুলতান ?

না। মনে হয়নি। আজ আপনার কথা শুনে হঠাৎ মনে হওয়ায় কথাটা আপনাকে বললাম।

অনেকক্ষণ অতঃপর কিরীটী চুপ করে রইল। একটা চুরোটে অগ্নিসংযোগ করে নিঃশব্দে ধূমপান করতে লাগল। মনে হল কিরীটী যেন কি ভাবছে।

সুলতান!

বাবুজী ?

ডি'সিলভা কলকাতায় এলে কোথায় থাকে তুমি জান ?

না তো বাবুজী। তবে সে আর কোথায় থাকবে—তার জাহাজেই থাকত।

আচ্ছা সেই লোকটিকে দেখলে তুমি চিনতে পারবে?

কেন পারব না—নিশ্চয়ই পারব।

লোকটা দেখতে কেমন বল তো?

লোকটা বেঁটে; গায়ের রং খুব ফর্সা, চ্যাপ্টা নাক, ছোট ছোট চোখ, পুরু ঠোঁট। ভারতীয় বলে ঠিক মনে হয় না।

বয়স কত হবে?

বছর চল্লিশ হবে।

আচ্ছা আজ তুমি যাও সুলতান, কাল হয়ত তোমার দোকানে একবার যেতে পারি। সন্ধ্যার দিকে দোকানে থাকবে তো?

থাকব।

অতঃপর সুলতান বিদায় নিল।

সুলতান বিদায় নেবার পরও অনেকক্ষণ কিরীটী নিঃশব্দে বসে বসে চুরোট টানতে থাকে। বুঝতে পারি কোন একটা চিন্তা কিরীটীর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।

বাইরে বৃষ্টি সমানে ঝরতে থাকে। ঘণ্টাখানেক বাদে আমি বিদায় নিলাম।

কিরীটী তখনও পূর্ববৎ সোফাটার উপর বসে অন্যমনস্কভাবে ধূমপান করে চলেছে।

বাইরে বের হয়ে দেখি কিরীটীর বাসার সামনে বেশ জল জমেছে। প্রায় গোড়ালি ডুবে যায়। হীরা সিংকে ডাকলাম।

হীরা সিং আমাকে একটু বাসায় পৌঁছে দেবে?

কেঁউ নেই সাব্—ঠারিয়ে, হাম আভি গাড়ি লয়তেহেঁ।

হীরা সিংই শেষ পর্যন্ত আমাকে গৃহে পৌঁছে দিয়ে গেল।

সারাটা দ্বিপ্রহর আমি ইউসুফের হত্যার ব্যাপারটাই চিন্তা করতে লাগলাম। সুলতানের কথায় মনে হল কোন ডাকাতি বা রাহাজানির ব্যাপার নয়। ইউসুফকে হত্যা করার পিছনে কারও কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু সেটা কি? কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

সেই ময়নাটার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তো?

ময়নাটা নিখোঁজ হয়েছে।

সুলতানের কথা শুনে মনে হয় ইউসুফ মিঞার নৃশংস হত্যার সঙ্গে হয়ত ঐ কালো পাখীটার কোন যোগসূত্র কোথাও আছে এবং ঐ হত্যার পিছনে কোন গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে।

সন্ধ্যার দিকে আবার কিরীটীর ওখানে গিয়ে দেখি কিরীটী তার বসবার ঘরে বসে আপন মনে তাস নিয়ে একা একা পেসেন্স খেলায় মগ্ন হয়ে আছে। পাশের সোফায় গিয়ে বসলাম।

আড়চোখে তাকালাম কিরীটীর মুখের দিকে, কিন্তু তার মুখের মধ্যে কোথায়ও কোন চিন্তার রেখা পর্যন্ত যেন নেই।

একটা ইংরাজী পিকটোরিয়াল টেনে নিয়ে সামনের সেণ্টার টেবিলের উপর রেখে তার পাতা ওলটাতে লাগলাম।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে একসময় কিরীটীই কথা বলল, তুই চলে যাওয়ার একটু পরেই পূর্ণ লাহিড়ী এসেছিলেন।

ডি. সি.?

হ্যাঁ।

হঠাৎ?

সঙ্গে এক ভদ্রমহিলা ছিলেন।

ভদ্রমহিলা?

হুঁ।

কে সে ?

সিঙ্গাপুরের এক বিখ্যাত জুয়েল-মার্চেন্ট মিঃ জোসেফের বর্মিনী স্ত্রী মা'থিন।

হঠাৎ কি ব্যাপারে তোর কাছে এসেছিলেন ?

ভদ্রমহিলার একটি বহু মূল্যবান মুক্তার হার চুরি গিয়েছে।

মুক্তার হার !

হ্যাঁ—তাঁর ধারণা সেটা ভারতবর্ষে এসেছে।

হঠাৎ ঐ রকম ধারণার কারণ।

কারণ একটা আছে বৈকি।

কি রকম ?

ভদ্রমহিলার রঘুনাথন নামে এক মালয়ালী ভৃত্য ছিল। মাস খানেক আগে হঠাৎ রঘুনাথন নিরুদ্দেশ হয়ে যায় এক সকালে—অনেক খোঁজ করেও তাকে পাওয়া যায় না এবং ঐদিনই ভদ্রমহিলা জানতে পারেন তাঁর বহুমূল্যবান সেই মুক্তার মালাটিও পাওয়া যাচ্ছে না।

মালাটা কোথায় ছিল ?

আগের দিন একটা পার্টিতে ভদ্রমহিলা ঐ মুক্তার মালাটি গলায় পরে পার্টিতে যান—ফেরেন অনেক রাত্রে একটু মত্ত অবস্থাতেই। তাঁর স্পষ্ট মনে আছে রাত্রে গৃহে ফিরে শয়নের পূর্বে মালাটি গলা থেকে খুলে নিজের মাথার বালিশের তলায় রেখে দিয়েছিলেন। দুপুরে সেই মালার কথা মনে পড়ায় মালার খোঁজ করতে গিয়ে দেখেন বালিশের নীচে মালাটি নেই। তখন তিনি ঘরের সর্বত্র খোঁজেন যদি অন্য কোথায়ও রেখে থাকেন রাত্রে, কিন্তু বহু অনুসন্ধান করেও সেটির আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

তারপর ?

আরও একটা ব্যাপার ঘটেছিল—

কি ?

ভদ্রমহিলার একটি ময়না পাখী ছিল।

ময়না পাখী ?

হ্যাঁ, ঠিক যেমনটি আমরা সুলতানের মুখে শুনেছি তেমনি একটি ময়না ঐ মহিলার ছিল। রঘুনাথনের নিরুদ্দেশের সঙ্গে সঙ্গে খাঁচা সমেত ঐ ময়নাটিও নিখোঁজ।

সত্যি !

হ্যাঁ। আর সেই কারণেই পরশু সকালের প্লেনে ঐ মহিলা কলকাতায় এসে পৌঁচেছেন—এখানকার পুলিসের সাহায্যে যদি কোন উপায়ে বের করা যায় তাঁর মুক্তার মালাটি—কারণ তাঁর স্থির বিশ্বাস ঐ মুক্তার মালা, ময়না পাখাটি ও রঘুনাথনের সঙ্গে একটা যোগাযোগ আছে। পূর্ণ লাহিড়ী তাই মহিলাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছিলেন।

তবে কি কিরীটী—

কি ?

ঐ ইউসুফের হত্যার সঙ্গে—

আমার ধারণা তাই সুব্রত। এবং আমার অনুমান যদি ভুল না হয় তো ইউসুফ ঐ ময়নাটিকেই কিনেছিল ডি'সিলভার সঙ্গের সেই লোকটির কাছ থেকে—ওই পর্যন্ত বলেই সহসা কিরীটী সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

সুব্রত !

কি ?

চল্, একবার বেরুব।

রাত তখন আটটা হবে। বাইরে বৃষ্টি নেই বটে তবে আকাশ মেঘে মেঘে থমথম করছে।

এ সময় কোথায় বেরুবি ? বাইরে আকাশের অবস্থা ভাল নয়। বললাম আমি। কিরীটী সে কথায় কোন কর্ণপাত না করে বললে, তুই বস্ সুব্রত, চট্ করে জামাটা গায়ে দিয়ে আসছি আমি।

কিরীটী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

গাড়ি যখন রসা রোডে পড়ল ওভারব্রীজটার তলা দিয়ে, ঝমঝম করে বর্ষণ শুরু হয়ে যায়।

কিন্তু চলেছিস কোথায় এই বৃষ্টির মধ্যে?

প্রশ্নটা করে তাকালাম আমি আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট কিরীটীর মুখের দিকে। অন্ধকারে কিরীটীর মুখটা ভাল দেখা যায় না কিরীটী আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে একটা চুরোটে অগ্নিসংযোগ করতে ব্যস্ত হয় লাইটারের সাহায্যে। চুরোটটা ধরানো হলে পর বলল, আমাকে নয় হীরাসিংকে উদ্দেশ করে, হীরা সিং, গ্র্যাণ্ড হোটেল।

হীরা সিং নিঃশব্দে কেবল একবার মাথাটা হেলাল।

প্রবল বর্ষণের মধ্যে দিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলেছে—ওয়াইপার দুটো ঘন ঘন ওঠা নামা করছে উইণ্ডস্ক্রীনের মসৃণ গাত্রের উপর কিন্তু তাতে করে সামনের রাস্তাটা যে খুব স্পষ্ট দেখা যায় তা নয় বরং ভিতরের বাষ্পে কেমন ঝাপসা-ঝাপসা হয়ে যায়।

ট্রাম, লরি, বাস, ট্যাক্সি ও প্রাইভেট কারগুলো যথাসাধ্য নিজেদের বাঁচিয়ে এদিক ওদিক চলেছে।

তারই মধ্যে দিয়ে ছাতা মাথায় পথিকের দল চলেছে। পথের দু পাশে দোকানের সামনে প্রবল ধারার হাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য মানুষের ভিড় জমেছে।

ভাবছিলাম কিরীটী হঠাৎ গ্র্যাণ্ড হোটেলে এ সময় চলেছে কেন ?

হঠাৎ কিরীটীর কথায় চমক ভাঙল।

সুব্রত!

কি?

ম্যাডাম মা'থিন গ্র্যাণ্ডে উঠেছে—তার ওখানেই যাচ্ছি। একদম মনে ছিল না রে—ভদ্রমহিলা আজ সন্ধ্যার সময় তাঁর সুইটে ড্রিঙ্কের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

কথাটা যদিও আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়—কারণ কিরীটী এই বৃষ্টির মধ্যে কেবল এক স্বল্পপরিচিতা মহিলার ড্রিঙ্কের আমন্ত্রণে তার হোটেল সুইটে চলেছে, কাথাটা আর যেই বিশ্বাস করুক আমি বিশ্বাস করতে পারি না।

তাই চুপ করেই রইলাম।

তোকে কিন্তু একটা কাজ করতে হবে সুব্রত!

কি? আবার তাকালাম কিরীটীর মুখের দিকে অন্ধকারে।

আমি যখন ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলব তুই যতটা সম্ভব চারিদিক নজর দিয়ে দেখবি।

তুই কি ড্রিঙ্কের নিমন্ত্রণ রাখতেই চলেছিস?

তাছাড়া আর কি! ভদ্রমহিলা খুব অ্যাকমপ্লিস্‌ড্—আলাপ করে আনন্দ পাবি। চোখে-মুখে একটা বুদ্ধির প্রাখর্য আছে।

আমি কোন জবাব দিই না।

হোটেলে পৌঁছে—লিফটে তিনতলায় উঠে আসার লম্বা করিডোরটা অতিক্রম করে নির্দিষ্ট স্যুইটের সামনে গিয়ে পৌঁছলাম।

বেল টিপতেই ভিতর থেকে নারীকণ্ঠে আহ্বান এল, কাম ইন!

॥ চার ॥

ভিতরে প্রবেশ করে স্যুইটের সিটিং-রুমেই ভদ্রমহিলার সঙ্গে মুখোমুখি হলাম।

ভদ্রমহিলা সত্যিই সুন্দরী—দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত নিঃসন্দেহে।

বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হবে। রোগা পাতলা গড়ন। গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল গৌর। ' পরনে বর্মিনীদের ধরনের একটি দামী সিল্কের লুঙ্গি ও গায়ে আদ্দির ফুলহাতা জামা। মুখের গড়ন ঠিক বর্মিনীর মতই।

পাতলা একটা প্রসাধনের ছাপ মুখে। মাথায় বিরাট একটি প্যাগোডা খোপা। দু হাতে তিনগাছা করে হীরকখচিত চুড়ি, গলায় হীরার কন্ঠি, কানে হীরার দুল। উজ্জ্বল আলোয় হীরকখণ্ডগুলি যেন ঝিলিক হানছিল।

গুড্ ইভনিং—আসুন মিঃ রায়, আপনার জন্যেই আমি অপেক্ষা করছিলাম। কথাটা বলে মহিলা আমার দিকে একবার তাকিয়ে পুনরায় কিরীটীর দিকে দৃষ্টিপাত করল।

আমার বন্ধু—সহকারী—সুব্রত রায়।

মহিলা প্রত্যুত্তরে মৃদু হেসে বললে, আপনারা দুজনেই রায়?

হ্যাঁ। হাসল জবাবে কিরীটী।

বসুন।

মুখোমুখি দুটো সোফায় আমরা বসলাম। মহিলাও বসল মুখোমুখি।

বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে, তাই না?

হ্যাঁ। কিরীটী জবাব দিল।

বৃষ্টি দেখে ভাবছিলাম বোধ হয় আসতে পারবেন না।

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, এ সময় তো বৃষ্টি হবেই—মনসুন—

উনি যখন আপনার সহকারী—আমরা নিঃসংকোচেই কথাবার্তা বলতে পারি মিঃ রায়, তাই তো ?

হ্যাঁ।

মালা।

মহিলার ডাকে ভিতরের ঘর থেকে একটি চব্বিশ-পঁচিশ বছরের বর্মী তরুণী বের হয়ে এল।

ইয়েস ম্যাম্—

বুঝলাম মালা ঐ মহিলার পরিচারিকা।

মালাও দেখতে সুন্দরী এবং পরিচারিকা হলেও তার বেশভূষা দামী এবং চোখে মুখে প্রসাধনের চিহ্ন সুস্পষ্ট।

মালা, ড্রিঙ্কস—কি দেবে বলুন মিঃ রায়—হুইস্কি ?

আসুন।

আমার কাছে কিন্তু সব রকম ড্রিঙ্কই আছে—অন্য কিছু যদি –

না, হুইস্কিই আনতে বলুন।

বলা বাহুল্য ইংরাজীতে কথাবার্তা চলছিল। ভদ্রমহিলা চমৎকার শুদ্ধ ইংরাজী বলে।

মালা চলে গেল।

আরও আধ ঘণ্টা পরে। দ্বিতীয় রাউণ্ড ড্রিঙ্ক চলেছে তখন। দেখলাম ভদ্রমহিলা বেশ ভালই ড্রিঙ্ক করতে অভ্যস্ত।

কিছুক্ষণ নানা ধরনের কথাবার্তার পর হঠাৎ একসময় ভদ্রমহিলা বলে, মিঃ লাহিড়ী বলছিলেন, আপনি ঠিকই আমার হারটা উদ্ধার করে দেবেন।

কিরীটী কোন জবাব দেয় না।

মহিলা আবার বলে, আমি যখন আমার স্বামীকে বললাম, এ আর কারও কাজ নয়—ওই রঘুনাথনেরই কাজ আর সে হারটা

চুরি করে সোজা ইণ্ডিয়াতেই এসেছে, জোসেফ কি বলেছিল জানেন ?

কী ?

বলেছিল তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে জেনো সে হার কোন দিনই ফিরে পাওয়া যাবে না। কারণ রঘুনাথনকে কোন দিনই আর trace করতে পারবে না। আচ্ছা মিঃ রায়—

বলুন ?

একবার ওর দেশে গিয়ে খোঁজ করলে হত না ?

একটা কথা মিসেস জোসেফ—

কি বলুন তো ?

ওই রঘুনাথনের কোন ছবি আপনার কাছে আছে ?

ছবি ? You mean photo ?

হ্যাঁ।

আমার album-এর মধ্যে থাকতে পারে। Yes—হ্যাঁ, মনে পড়ছে—আমার পাখীটার খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে ও যখন একদিন পাখীটাকে খাওয়াচ্ছিল আমি পাখীটার একটা ফটো নিয়েছিলাম—বোধ হয় সেটা আমার albnm-এ আছে।

রঘুনাথনই কি পাখীটাকে খাওয়াত নাকি ?

হ্যাঁ। পাখীটা ওকে খুবই ভালবাসত। বেশীক্ষণ ওকে না না দেখতে পেলেই পাখীটা চেঁচাত নাথন নাথন করে।

তাই বুঝি ?

হ্যাঁ। সামনে এসে চুপ করত।

মিসেস জোসেফ।

বলুন ?

Album টা কি আপনার সঙ্গে আছে ?

হ্যাঁ।

একবার দেখতে পারি albumটা ?

আনছি আমি।

মহিলা উঠে গেল এবং একটু পরেই সুদৃশ্য চামড়ার দামী একটা অ্যালবাম হাতে ঘরে এসে ঢুকল।

এই যে—

মহিলা নিজেই পাতা উল্‌টে ফটোটা বের করে দিল।

কিরীটী হাতে নিয়ে অ্যালবামের ফটোটা দেখতে লাগল। আমিও দেখি। হঠাৎ চোখ তুলতেই নজরে পড়ল দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে মালা।

মালার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে সরে গেল চট্ করে দরজার আড়ালে।

এই ফটোটা আমি নিতে পারি ?

নিশ্চয়ই—খুলে নিন না।

কিরীটী অ্যালবাম থেকে ফটোটা খুলে নিল। পোস্টকার্ড সাইজের সিপিয়া প্রিণ্টিং করা ফটোটা। খুব ভাল উঠেছে ফটোটা।

পাখীটার ক্লোজ-আপে ফটোটা তোলায় রঘুনাথনের মুখটাও স্পষ্ট উঠেছে। রঘুনাথন বোধ হয় ফটো তোলার সময় যে ফটো তুলছিল তার দিকেই তাকিয়ে ছিল।

মহিলা আবার বলে, জোসেফ আমাকে ইণ্ডিয়াতে আনতে দিতে চায়নি—একপ্রকার জোর করেই আমি চলে এসেছি—কারণ হারটার সঙ্গে আমার একটা সেণ্টিমেণ্ট জড়িয়ে ছিল—

কি রকম ? কিরীটী প্রশ্ন করে।

জোসেফ আমার স্বামী হলেও বলব, মানুষ বড় কৃপণ প্রকৃতির।

তাই বুঝি ?

হ্যাঁ। হাত দিয়ে তার কখনও একটা পয়সা গলে না। তবু গত বছর আমাদের ম্যারেজ অ্যানিভারসারি ডে-তে সে ওই পার্লের

হারটা আমাকে প্রেজেণ্ট করেছিল—আর আমাদের এগার বছরের ম্যারেড লাইফে ওই প্রথম তার বিবাহ-বার্ষিকীতে মূল্যবান প্রেজেণ্ট আমাকে। যার দাম কমপক্ষেও ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকা।

কিন্তু তাই যদি বলেন তো—

কিরীটীর মুখের কথা শেষ হল না, মা'থিন বললে, বুঝতে পেরেছি আপনি আমার এ হীরার সেটটার কথা বলছেন তো ?

হ্যাঁ—ম্যানে—

কিন্তু ওই সেটটা জোসেফের দেওয়া নয়।

যদি কিছু মনে না করেন তো—

মনে করবার কিছু নেই মিঃ রায়—মা'থিন হাসল। হেসে বললে এটা আমার বাবার বিয়েতে দেওয়া উপহার।

কিন্তু মনে হচ্ছে ও হীরাগুলো নকল নয়—অনেক দাম হবে।

আমার বাবার আমিই একমাত্র সন্তান। বাবারও জুয়েলারীর ব্যবসা আছে—রেঙ্গুনের একজন ধনী নামকরা জুলেয়ার আমার বাবা।

একটা কথা বলব মিসেস জোসেফ ?

বলুন ?

অ্যালবামের প্রথম পাতাতেই যে ফটোটা দেখলাম আপনার পাশে—তিনি নিশ্চয়ই আপনার স্বামী ?

হ্যাঁ। আমার স্বামী। তাহলেও আমিই কিন্তু প্রথম পক্ষ। আমাদের দুজনার মধ্যে বয়সের পার্থক্য অনেক। প্রায় বাইশ বছর।

বাইশ বছর !

হ্যাঁ। যখন আমাদের বিয়ে হয় আমার বাইশ আর আমার স্বামীর চুয়াল্লিশ—rather he was an old man at that time. বাবার এতটুকু ইচ্ছা ছিল না আমাদের বিয়ের ব্যাপারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে মত দিতে হয়েছিল আমার একান্ত ইচ্ছা দেখে।

বলতে বলতে একটু থামল মা'থিন। হাতের গ্লাসটা তার শূন্য হয়ে গিয়েছিল, একটা বড় পেগ গ্লাসে ঢেলে সোডা মিশিয়ে দীর্ঘ একটা চুমুক দিয়ে বলতে লাগল আবার মা'থিন, জোসেফ দামী ও রেয়ার জুয়েলসের সন্ধানে বললে গেলে সারা পৃথিবীটা ঘুরেছিল তার দীর্ঘ বাইশটা বছর জীবনের—বিচিত্র তার সে অভিজ্ঞতা। মধ্যে মধ্যে সে রেঙ্গুনে আসত, আমাদের মার্চেন্ট স্ট্রীটের বাড়িতে থাকত। ওই আসা-যাওয়াতেই তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়।

মা'থিন আবার থামল।

তারপর ?

রাত্রে-খাওয়া-দাওয়ার পর বাইরের ঘরে বসে বসে জোসেফ তার জীবনের অভিজ্ঞতার কথা—নানা ধরনের দামী—রেয়ার জুয়েলসের বিচিত্র সব কাহিনী আমাকে শোনাত। গল্প-উপন্যাসের চাইতেও সে-সব রোমাঞ্চকর। আমি অদ্ভুত একটা thrill যেন অনুভব করতাম সেই সব কাহিনী জোসেফের মুখে শুনতে। একটু একটু করে তার প্রতি আমি আকৃষ্ট হই—হয়ত সমস্ত ব্যাপারটা আপনাদের কাছে absurd—অবিশ্বাস্য মনে হবে. কিন্তু তবু আমি যেন কেমন একটা আকর্ষণ অনুভব করতাম, আর সেই আকর্ষণই আসলে তার প্রতি অনুরক্ত করে তোলে ক্রমশঃ।

আমি বললাম ঐ সময়, rather interesting !

মা'থিন বলতে লাগল, ও কয়েকদিন পরে চলে যেত, আমি কিন্তু ওর পথ চেয়ে থাকতাম। আবার কবে ও আসবে! লুকিয়ে আমি অবশেষে ওকে পত্র লেখা শুরু করি। ওর জবাব আসত আমার এক বান্ধবীর ঠিকানায়। বলতে পারেন ঐ চিঠি লেখা-লেখির মধ্যে দিয়েই আমাদের পরস্পরের মধ্যে নিবিড় এক ভালবাসা গড়ে ওঠে।

তারপর ?

তারপর আর কি, একদিন আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। বাবা-মা প্রথমটায় খুব আপত্তি করেছিল, কিন্তু আমার জেদের কাছে তারা হার মানতে বাধ্য হল। চলে এলাম স্বামীর সঙ্গে সিঙ্গাপুরে···কিন্তু বিয়ের পর পাঁচটা মাসও গেল না, আমার ভুল ভেঙে গেল।

ভুল!

তাই বলব। ভুলই। কারণ দেখলাম আমাদের গৃহে যখন সে গিয়ে অতিথি হত, তখনকার আলাপ আলোচনা ও পরবর্তীকালে চিঠিপত্রের লেনদেনের ভিতর দিয়ে যে আলাপ-আলোচনা আমাদের হয়েছে সেটা জোসেফের চরিত্রের একটা দিক মাত্র এবং সেটা তার চরিত্রের আদৌ আসল দিক নয়।

কি রকম ?

জিজ্ঞাসা করলাম আমিই মা'থিনের মুখের দিকে তাকিয়ে।

যদিও ইতিমধ্যে আমরা—আমি বা কিরীটী দুটো পেগের বেশী খাইনি, মা'থিন কিন্তু ছ'টা পেগ শেষ করে সপ্তম শুরু করেছিল।

লিকারের প্রভাবে তখন তার মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। চোখের তারা দুটো চক্‌চক্‌ করছে। বেশ নেশা হয়েছে, আর হবারই কথা।

অনর্গল সে বকে চলেছে। নেশার প্রভাবে মানুষ এমনিই হয়—বল্গাহীন হয়ে পড়ে।

হাতের গ্লাসে আর একটা চুমুক দিয়ে মা'থিন বলে, মানুষটা দেখলাম জীবনে দুটি বস্তুই ভালবেসেছে—আর তা হচ্ছে ঐ সব জুয়েলস ও অর্থ। তার মনের সমস্ত কোমলতা—সেন্টিমেন্ট—আশা আকাঙ্ক্ষা সব যেন ঐ নীরস পাথরগুলো এবং অর্থকে ঘিরেই। অবিশ্যি সে যে আমাকে কোনরকম অবহেলা বা অযত্ন করত তা নয়—কিন্তু একজন অল্পবয়সী যুবতীর পক্ষে তার কি মূল্য বলুন—স্বামীর অবহেলা বা অযত্ন তবু সহ্য হয়—কিন্তু ক্যালাসনেস সহ্য হয় না!

মা'থিন আবার থামল।

একটু থেমে আবার বলতে লাগল. আমি যেন দিন-কে-দিন হাঁফিয়ে উঠতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত বাড়িতে আর টিকতে পারতাম না—বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতে শুরু করলাম। ক্লাবে-পার্টিতে যোগ দিয়ে সময় কাটাতে লাগালাম। অবশেষে ড্রিঙ্ক করতে শুরু করলাম।

আপনার স্বামী জানেন না এসব ?

সব জানে। কিন্তু সে কখনও আজ পর্যন্ত আমার কোন ব্যাপারে ইণ্টারফিয়ার করেনি। সেই থেকে গত কয় বছর ধরে সে আছে তার জুয়েলস আর অর্থ নিয়ে, আর আমি আছি আমার নিজস্ব জীবন নিয়ে। গত বছর আমাদের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারিতে আমি বলেছিলাম, আমাকে তো জীবনে আজ পর্যন্ত কিছুই প্রেজেণ্ট করলে না—এবারে এমন কিছু দাও যাতে অন্তত মনে হয় আমারও একটা প্রয়োজন তোমার জীবনে আছে।

তারপর ?

ও বললে, কি চাও বল ?

যা চাই প্রাণে ধরে দিতে পারবে তো !

পারব—বল।

তোমার সিন্দুকের মধ্যে একবার একটা বাক্সে তুমি কতগুলো সেরা মুক্তো দেখিয়েছিলে—ঐ মুক্তোগুলো দিয়ে আমাকে একটা হার করে দাও।

বেশ—দেব। বললে জোসেফ।

সেই মুক্তো দিয়েই বোধ হয় হারটা তৈরী হয়েছিল ?

হ্যাঁ।

কিন্তু এক কথায় মুক্তোগুলো তিনি আপনাকে প্রেজেণ্ট করে দিলেন, আশ্চর্য লাগছে ! প্রথমটায় আমারও তাই মনে হয়েছিল

পরে মনে হল ওই মুক্তোগুলো সারা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে জোসেফ সংগ্রহ করছিলো—ওগুলো সে বেচত না। অনেক টাকার অফার পেয়েও কখনও বেচেনি।

কেন?

সত্যই আশ্চর্য ছিল যেন সেই মুক্তোগুলো। সাদা মুক্তোগুলোর ভেতর থেকে যেন অদ্ভুত দ্যুতি বের হত—কোনটা নীল—কোনটা গোলাপী—কোনটা কমলালেবুর রঙ—জোসেফ বলত ওই ধরণের মুক্তো একই প্রকারের ও একই সাইজের বেশী হয় না। অত্যন্ত রেয়ার স্পেসিমেন সেগুলো। তাই ওর ওই মুক্তোগুলোর প্রতি একটা অদ্ভুত মমতা ছিল—প্রাণে ধরে কখনো বেচতে পারেনি। কিন্তু আমাকে দিলে সেগুলো বেচাও হল না, ঘরের জিনিস ঘরেই রইল তার চোখের সামনে—আমাকেও উপহারের সান্ত্বনা দেওয়া হল—তাই বোধ হয় সেগুলো দিয়ে আমাকে একটা হার করে দিতে তার আপত্তি হয়নি।

মুক্তোর হারটা চুরি যাবার পর নিশ্চয়ই আপনার স্বামীর খুব লেগেছে?

শুধু লাগেনি মিঃ রায়, ও যেন পাগল হয়ে গিয়েছে মুক্তোর হারটা হারিয়ে যাওয়ায়। খায় না দায় না—কোথাও বের হয় না—এমন কি ব্যবসা পর্যন্ত গুটিয়ে বসে আছে সেই অবধি।

স্বাভাবিক। বলি আমি।

ছাব্বিশ বছর ধরে একটা একটা করে ওই মুক্তোগুলো সে সংগ্রহ করে আগলে রেখেছিল যখের ধনের মত—কাজেই বুঝতে পারছেন সেই মুক্তোগুলো ওইভাবে চুরি যাওয়ায় তার মনের অবস্থা কি হতে পারে! সত্যি কথা বলতে কি মিঃ রায়, এখন আমার মনে হচ্ছে আমি যদি মুক্তোগুলোর ওপরে লোভ না করতাম তবে তো সে আমাকে দিত না আর সেগুলোকে অমন করে হারাতেও হত না।

সব কিছুর জন্য আজ তাই আমার নিজেকেই অপরাধী মনে হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। আমি যেন কিছুতেই নিজের মনকে সান্ত্বনা দিতে পারছি না।

মা'থিনের চোখের কোল দুটো জলে ভরে আসে। নেশায় রক্তিম চোখ দুটো জলে টলমল করতে থাকে। আর এও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়, মুখে ওই মহিলা একটু আগে যাই বলুক—ওর স্বভাবে-চরিত্রে যতই অসামঞ্জস্য থাক্, ও ওর স্বামী জোসেফকে সত্যিই ভালবাসে। আর হয়ত নিজেও সে কথাটা নিজে জানে না।

কথা বলা বোধ হয় শেষ হয়ে গিয়েছিল মা'থিনের, সে অতঃপর কেমন যেন ঝিম্ দিয়ে বসে থাকে।

রাত বেশ হয়েছে। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম রাত তখন প্রায় সোয়া এগারটা। বাইরে এখনও বৃষ্টি পড়ছে কিনা কে জানে।

শীততাপ নিয়ন্ত্রিত হোটেলের ঘরের মধ্যে বসে সে কথা জানবারও উপায় ছিল না।

কিরীটীও চুপচাপ বসে।

তার বসবার ভঙ্গির মধ্যে শীঘ্র ওঠবার কোন লক্ষণই যেন পরিলক্ষিত হয় না।

ঘরের মধ্যে আমাদের তিনজনকে নিয়ে একটা স্তব্ধতা থমথম্ করছে।

হঠাৎ কিরীটীই স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললে, আচ্ছা মিসেস জোসেফ, আপনার যে হারটা খোয়া গিয়েছে তার মধ্যে কতগুলো মুক্তো ছিল বলতে পারেন?

ওই মুক্তোর মালার মধ্যে যে মুক্তোর কথা একটু আগে বলেছি সব তা ছিল না।

তবে?

রেয়ার ও মূল্যবান মুক্তো ছিল গোটা-কুড়িক—তার মধ্যে ব্লু কুইন মুক্তোটি ছাড়াও গোটা এগারোর দাম সব চাইতে বেশী—অন্তত বিশ হাজার তো তার দাম হবেই। বাকিগুলো ছিল যদিও আসল মুক্তো, তাহলেও অত দামের নয়।

আর কতগুলো মুক্তো ছিল?

বোধ হয় সব সমেত আটচল্লিশটা। কিন্তু ও কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন মিঃ রায়?

কারণ মুক্তোগুলো সব হয়ত পারব না আমরা শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করতে।

পারা যাবে না?

না। কারণ আমার অনুমান—

কী?

মুক্তোর মালাটা যে চুরি করেছে সে সঙ্গে সঙ্গেই হার থেকে মুক্তোগুলো খুলে ফেলেছে।

কেন—ও কথা বলছেন কেন?

যেহেতু চোরের—ঐ মালার মধ্যে সত্যিকারের আসল ও রেয়ার যে মুক্তোগুলো ছিল সেগুলোর উপরেই তার লোভ ছিল। সে হয়ত তাই মালাটা হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মালা থেকে সে মুক্তোগুলো খুলে নিয়েছে—আর সব মুক্তোগুলোও হয়ত একজনের কাছে নেই। কি বলছেন আপনি মিঃ রায়?

মুক্তোগুলো লুকিয়ে রাখতে হলে সেটাই প্রকৃষ্ট উপায়। আচ্ছা যে বিশেষ মুক্তোগুলোর কথা একটু আগে আপনি বললেন তার এক-একটির সাইজ কি রকম হবে?

কম-বেশী এক একটা মটরের আকার হবে।

আচ্ছা মিসেস্ জোসেফ, আজ রাত অনেক হল, এবারে আমরা উঠব।

সে কি, এত রাত্রে কিছু না খেয়ে যাবেন ?

আজ নয়—যদি আপনার মুক্তোগুলো উদ্ধার করতে পারি তাহলে একদিন সে ভোজ খাওয়া যাবে।

সে রাত্রের মত অতঃপর আমরা বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

॥ পাঁচ ॥

বাইরে বের হয়ে দেখি বৃষ্টি তখনও ঝরছে।

তবে বর্ষণ প্রবল নয়—ঝিরঝিরে বর্ষণ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন কালো। এলোমেলো জলো হাওয়া বইছে। গাড়িতে উঠে বললাম, আমাকে নামিয়ে দিয়ে যা কিরীটী।

আর কৃষ্ণা হয়ত ওদিকে আমাদের জন্য গরম খিচুড়ি করে অপেক্ষা করছে! হীরা সিং, কোঠি চল।

আমি আর প্রতিবাদ করলাম না।

গাড়ি কিরীটীর গৃহের দিকেই চলল।

কিরীটী!

উঁ ?

তুই কি সত্যিই মনে ভাবিস—

কী ?

ঐ মুক্তোগুলোর সন্ধান করতে পারবি ? সেগুলো হয়ত এতদিনে কোন্ সুদূরে পাচার হয়ে গিয়েছে।

সম্ভব নয়।

কেন ?

প্রথমতঃ ঐ মুক্তোগুলোর দাম একমাত্র সাচ্চা জহুরীর কাছেই—সবাই ওর মূল্য বুঝবে না; দ্বিতীয় যে মুক্তোগুলো সরিয়েছে সে ভাল

করেই জানে জোসেফের প্রাণ ছিল ঐ মুক্তগুলো এবং সে রীতিমত একজন জুয়েলার হিসাবে পরিচিত ব্যক্তি—তার অর্থেও আছে, কাজেই সে এত সহজে ব্যাপারটা হজম করে নেবে না হয়ত; তৃতীয় ঐ মুক্তো ক্রয়ের জন্য উপযুক্ত খরিদ্দার চাই—

কিন্তু ধর সে যদি সিঙ্গাপুরেই ওর খরিদ্দার পেয়ে গিয়ে থাকে ?

পেলেও সে মুক্তোগুলো ঐ সিঙ্গাপুরে বসেই বেচা-কেনার সাহস পাবে না। কাজেই তাকে সিঙ্গাপুর ছেড়ে অন্যত্র যেতে হবেই এবং সেদিক দিয়ে ভারতবর্ষের মত জায়গাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান।

তাহলে মুক্তো-চোর বর্তমানে নিশ্চয়ই এখানেই এসেছে তোর ধারণা ?

নিঃসন্দেহে।

কিন্তু ইউরোপও তো সে যেতে পারে ?

পারে, কিন্তু সেখানে বিক্রি করার চাইতে এখানে তার আরও সুবিধা হবে। তাছাড়া এই ব্যাপারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট আর একটা বিশেষ ব্যাপার তুই ভুলে যাচ্ছিস কেন সুব্রত ?

কি ?

সেই কালো পাখাটা !

কালো পাখী ?

হ্যাঁ রে, সেই ময়না পাখাটা !

তোর কি ধারণা তাহলে সত্যিসত্যিই ঐ কালো পাখীটার সঙ্গে জোসেফের মুক্তোগুলো চুরি হওয়ার কোন যোগাযোগ আছে ?

কেবলমাত্র ধারণা নয় সুব্রত, আমি বলতে পারি এখন একেবারে স্থির নিশ্চিত।

সত্যি ?

হ্যাঁ, যার প্রথম পর্বে মুক্তার মালাটি চুরি—দ্বিতীয় পর্বে মা'থিনের ভৃত্য রঘুনাথনের অকস্মাৎ নিরুদ্দেশ ও সেই সঙ্গে সেই কালো

পাখীটা—তৃতীয় পর্বে উভয়ের ভারতে আগমন—চতুর্থ পর্বে হতভাগ্য চিড়িয়া-ব্যবসায়ী ইউসুফ মিঞার অজ্ঞাতে অগ্নিতে হস্ত-প্রসারণ—পঞ্চম পর্বে তার নৃশংস মৃত্যু ও সেই সঙ্গে পুনরায় সেই কালো পাখীটির নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া—সব ঘটনাগুলোই যদি বিচার করিস তো দেখবি একের অন্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে এবং যা আমাদের চক্ষুতে অঙ্গুলি প্রদর্শন করে বলে দিচ্ছে মুক্তোগুলো সিঙ্গাপুর থেকে ভারতবর্ষেই এসেছিল।

তারপর ?

তারপরের ব্যাপারটি অবশ্যই কিছুটা জটিল।

জটিল কেন ?

জটিল হচ্ছে, ওই ঘটনার সঙ্গে ডি'সিলভা কেমন করে জড়িত হয়ে পড়ল। তারপর যে স্যুট-পরিহিত লোকটি—দেখতে বেঁটে, গায়ের রং ফর্সা, চেপ্টা নাক, ছোট ছোট চোখ, পুরু ঠোঁট, বছর চল্লিশ বয়স—যার বর্ণনা শুনে ভারতীয় বলে মনে হয় না, ময়নাটা কিনতে ইউসুফের দোকানে এসেছিল দিন সাতেকের মধ্যেই—সে লোকটি কে? সে অবশ্যই ময়নাটার খোঁজ পেয়েছিল, কেমন করে পেল ?

হয়ত ডি'সিলভার কাছে, শুনেছিল সে।

না।

কেন ?

তাই আমার ধারণা। সে কোনক্রমে জানতে পারে ব্যাপারটা। তাই ময়নাটা হাতাবার জন্য দু হাজার টাকা পর্যন্ত দর তুলে একটা চান্স নিয়েছিল মাত্র, তাতে যখন হল না সে চলে গেল। অবশ্যই সে চোখের আড়ালে গেলেও, ময়নাটার লোভ ছাড়তে পারেনি এবং সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।

তুই কি তবে বলতে চাস কিরীটী, সেই লোকটাই—

আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তো সুব্রত সে-ই ইউসুফের হত্যাকারী ও ময়না-চোর।

তাহলে ডি'সিলভা বা যে লোকটি ময়না বেচেছিল তারা কি—

না, তারা ময়নাটার সত্যিকারের দাম জানত না, কল্পনাও করতে পারেনি।

ডি'সিলভার সঙ্গে যে লোকটি ময়না বেচতে এসেছিল সে কি রঘুনাথন?

সম্ভবতঃ নয়।

তবে কে?

সে এক তৃতীয় ব্যক্তি। হয়ত—

কী?

ইউসুফের মত তাকেও অঘোরে প্রাণ দিতে হয়েছে ওই ময়নাটার জন্যই।

বলিস কি!

হ্যাঁ—ময়নাটা চুরি পর্যন্তই তার শেষ কীর্তি? তারপরেই তাকে লোভের দণ্ড দিতে হয়েছে।

আমি তোর কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না এখনও। তাছাড়া তুই ধারণাই বা করছিস কি করে রঘুনাথন নিহত হয়েছে?

ঐ মুক্তোগুলো অভিশপ্ত রে।

অভিশপ্ত—মানে?

মানে সেই মুক্তোই রঘুনাথনের মৃত্যুর কারণ বলে।

মুক্তোগুলো!

হ্যাঁ—কিন্তু আর না, বাড়ি পৌঁছে গিয়েছি। কৃষ্ণার টেম্পারের মারকারী কলমটা হয়ত এখন শেষ উর্ধ্ব সীমানায় আরোহণ করেছে, আমাদের বিলম্বের জন্য, চল্।

সত্যি, গাড়ি এসে ঐ সময় দোরগোড়ায় থামল।

বৃষ্টি তখনও ঝিরঝির করে অবিশ্রান্ত পড়ছে।

॥ ছয় ॥

কৃষ্ণা সত্যিই চটে গিয়েছিল।

কারণ ইদানীং কিরীটীর রক্তচাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় কিরীটীর খাওয়া বিশ্রাম সম্পর্কে সে অত্যন্ত সজাগ থাকত। এতটুকু অনিয়ম সে বরদাস্ত করতে পারত না।

দুজনকে ঘরে ঢুকতে দেখে কৃষ্ণা বলে, এই তোমাদের ঘণ্টা-দুই! তুমি একটা অঘটন না ঘটিয়ে ছাড়বে না দেখছি।

মরতে তো একদিন হবেই প্রিয়ে—তা সে মৃত্যু যদি 'করোনারী' হয় তার চাইতে সুখের মৃত্যু আর কি হতে পারে!

ঠিক আছে, একটা মুহূর্ত কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, মনে থাকবে কথাটা আমার।

ভুল হয়ে গিয়েছে—মুখ ফসকে বের হয়ে গিয়েছে, আর এমনটি হবে না—এবারটির মত ক্ষমা-ঘেন্না করে—

থাক, থাক। কৃষ্ণা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

দিলি তো চটিয়ে ওকে! বললাম আমি।

কিরীটী মৃদু হাসল।

চল্ আর দেরি করিস না, সত্যিই রাত অনেক হয়েছে—খাবার টেবিলে গিয়ে বসা যাক।

তুই যা, আমি আসছি—আমায় একটা জরুরী ফোন করতে হবে।

এত রাত্রে কাকে আবার ফোন করবি?

পূর্ণ লাহিড়ীকে।

এই রাত পৌনে বারোটায়?

কথাটা জরুরী, তাকে জানানো দরকার এখুনি।

কথাটা বলে কিরীটী এগিয়ে গিয়ে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে ডায়েল করে। একটু পরেই বোধ হয় অন্য পাশ থেকে সাড়া পাওয়া গেল।

হ্যাঁ, আমি কিরীটী লাহিড়ী সাহেব। রেঙ্গুনগামী জলযান জাহাজটা কবে ছাড়ছে ক্যালকাটা পোর্ট থেকে একটা খবর নিতে পারেন? এখুনি পারবেন? ঠিক আছে, জেনে এখুনি এই রাত্রেই আমাকে জানান।

জাহাজটা তো পোলিশ জাহাজ, তাই না! হ্যাঁ হ্যাঁ—আচ্ছা—

ফোনটা রেখে দিয়ে কিরীটী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, চল্

টেবিলে খেতে বসে দেখি দুজনার মত প্লেট।

বললাম সামনে দণ্ডায়মান কৃষ্ণাকে, কি ব্যাপার, তুমি খাবে না?

না। কৃষ্ণা বলে।

তাহলে আমিও খাব না। বললাম আমি।

আমি খেয়েছি। কৃষ্ণা জবাব দেয়।

বিশ্বাস করি না।

বাঃ, বিশ্বাস না করার কি হয়েছে, সত্যিই আমি খেয়েছি।

বিশ্বাস করব না কেন, সত্যিই তুমি খাওনি এখনও। বলি আমি, যাও, তোমারটাও নিয়ে এস, একসঙ্গেই খেতে খেতে আজকের অভিযানের গল্প তোমায় শোনাব।

ও আমি শুনতে চাই না।

নাই শুনলে—কান বন্ধ করে খেয়ে যেও।

বলছি খেয়েছি আমি?

বলছি তুমি খাওনি।

সত্যি তোমাকে নিয়ে পারি না সুব্রত।

অনেক দেরিতে বুঝেছ দেবী। যাও, ক্ষিধেয় পেট চোঁ চোঁ করছে, ত্বরা কর দেবী।

কৃষ্ণা অতঃপর আর দেরি করে না—আমাদের সঙ্গেই বসে পড়ে।

খাওয়া প্রায় যখন শেষ হয়ে এসেছে—পাশের ঘরে ফোন বেজে উঠল। ক্রিং ক্রিং ক্রিং···

কিরীটী তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিল।

হ্যালো—হ্যাঁ কিরীটী, কি বললেন, কাল সকালে ভোর পাঁচটায় ছাড়বে জাহাজ! যেমন করে হোক আপনাকে পোর্ট পুলিসের সাহায্যে বাটোরির ডিপারচারের সময় অন্ততঃ ঘণ্টা কয়েক পিছিয়ে দিতে হবে। আরে পারবেন পারবেন—সবই জানতে পারবেন—শুনুন, ভোর পাঁচটা নাগাদ আপনি এখানে চলে আসবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই গরীবের গৃহে। হ্যাঁ, দুজন আর্মড কনস্টেবল নেবেন ও নিজে আগ্নেয়-অস্ত্রের দ্বারা শোভিত হয়ে আসবেন। কিছু মুশকিল নয়—আপনি অনায়াসেই ঐ ব্যবস্থাটুকু করতে পারবেন মিঃ লাহিড়ী। আচ্ছা, আপাততঃ গুড্ নাইট্।

কিরীটী ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রেখে খাবার ঘরে আবার ফিরে এল।

সুব্রত!

কি?

রাত এখন সাড়ে বারোটা—ঠিক সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় দেব—যা শুয়ে পড়্ গিয়ে—একটু ঘুমিয়ে নে—ঠিক ভোর চারটেয় উঠতে হবে।

ব্যাপার কি? অত ভোরে কোথায়ও যেতে হবে নাকি?

হ্যাঁ।

কোথায় ?

কালই জানতে পারবি। যা, শুয়ে পড়্ গে।

কিরীটী কথাগুলো বলে আর দাঁড়াল না। ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

লাহিড়ীর সঙ্গে ফোনে একটু আগে কিরীটীর যে কাটা-কাটা একতরফা কথাগুলো হল তাতে এইটুকু বুঝতে পেরেছি, কোন একটি জাহাজের সিডিউল ডিপারচার যাতে ক্যানসেল করা হয় সে সেইমত লাহিড়ীকে নির্দেশ দিল।

কিন্তু কেন ? তবে কি ঐ জাহাজেই মুক্তা-চোর পগারপার দেবার মতলব করেছে ? কিন্তু কে সে ? লোকটা কে ? সেই চ্যাপ্টা মুখ—ভোঁতা নাক—কুতকুতে চোখ লোকটা যে ডি'সিলভার সঙ্গে এসেছিল ? ময়নার সওদা করতে ইউসুফের দোকানে, সে-ই তাহলে সকল নাটের গুরু !

কিরীটীর চোখমুখের চেহারা দেখে মনে হয় সে কোন একটা স্থির সিদ্ধান্তে ইতিমধ্যে পৌঁচেছে—কোন রহস্যের শেষ মীমাংসার কাছাকাছি এসে চিরদিনই কিরীটী সহসা অমনি গম্ভীর হয়ে যায়। মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি নিয়ে নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শয্যায় আশ্রয় নিলাম, কিন্তু ঘুম আসে না।

বাইরে আবার বৃষ্টি জোরে শুরু হল। হয়ত কালকের রাতের মত আজও সারাটা রাতই বৃষ্টি ঝরবে।

এখন অন্ততঃ বুঝতে পারছি—মা'পিনের সেই বহু মূল্যবান মুক্তোর মালার সঙ্গেই জড়িত আছে সেই আশ্চর্য ময়না পাখীটির চুরি যাওয়া এবং হতভাগ্য ইউসুফের হত্যা।

কিন্তু যোগসূত্রটা কোথায় ? কোথায় মুক্তার মালার সঙ্গে সেই ময়না পাখীটির যোগাযোগ রয়েছে ? কোন্ অদৃশ্য সূত্রে দুটি ব্যাপার নিষ্ঠভাবে পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে ?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মত যেন একটা সম্ভাবনা মনের পাতায় উঁকি দিয়ে যায়।

তবে কি—

কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হয় অতগুলো মুক্তো—

তাছাড়া—

নাঃ, সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যেতে থাকে।

চিন্তা করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একে দু পেগের নেশা—তার উপরে ভরপেট গরম খিচুড়ি ও মাংসের কোর্মা—আপনা থেকেই কখন দু চোখের পাতা ঘুমে ভারী হয়ে বুজে এসেছিল।

কিরীটীর ডাকে ঘুমটা ভেঙে গেল।

এই সুব্রত, ওঠ্ ওঠ্!

ধড়ফড় করে শয্যার ওপর উঠে বসলাম।

তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নে—কৃষ্ণার চা রেডি—এখুনি হয়ত লাহিড়ী সাহেব এসে যাবেন।

॥ সাত ॥

রাত তখন তিনটে পঁয়ত্রিশ।

বাইরে তখনও বৃষ্টি ঝরছে—তবে খুব প্রবল বর্ষণ নয়। আকাশ কালির মত কালো।

হাত-মুখ ধুয়ে চায়ের টেবিলে এসে দেখি চা ও প্রাতঃরাশ ইতিমধ্যেই কৃষ্ণা প্রস্তুত করে ফেলেছে।

কিরীটী তখনও টেবিলে এসে পৌঁছয়নি। একটু পরেই কিরীটী ঘরে এসে ঢুকল, একেবারে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়েই। গরম গরম

ওমলেট ও টোস্ট শেষ করে চায়ের কাপে তখন আমরা চুমুক দিচ্ছি, নীচে লাহিড়ী সাহেবের জীপের হর্ন শোনা গেল।

ভদ্রলোক খুব পাংচুয়াল, এসে গেছেন! কিরীটী বলে।

আমি কোন জবাব দিই না। চায়ের কাপটায় চুমুক দিতে থাকি।

কৃষ্ণা!

কী?

জংলী'হীরা সিংকে তুলে দিয়েছে তো—গাড়ি বের করবার জন্য?

হ্যাঁ।

তোর গাড়িতে যাবি নাকি? প্রশ্নটা আমিই করি কিরীটীকে।

হ্যাঁ।

তবে লাহিড়ী সাহেবকে জীপ আনতে বললি?

প্রথমতঃ জীপ গাড়িটাই তো একটা মার্কামারা গাড়ি, তার উপরে পুলিসের জীপ! আমরা আমার গাড়িতেই যাব।

নীচে নেমে এসে দেখি লাহিড়ী সাহেব জীপ থেকে নেমে সিগারেট টানছেন। পাশেই কিরীটীর গাড়ি দাঁড়িয়ে।

সুপ্রভাত!

কিরীটীই প্রথমে স্বাগত জানায়।

সুপ্রভাত!

লাহিড়ী সাহেব?

বলুন।

আপনার জীপ আমাদের ফলো করবে একটু দূরত্ব রেখে।

সেইমতই ব্যবস্থা হল, লাহিড়ী কোন প্রতিবাদ জানালেন না।

ট্রামরাস্তায় এসে আমাদের গাড়ি পড়ল। যতদূর দৃষ্টি চলে, একেবারে জনহীন রাস্তা। ঝিরঝির বৃষ্টি যেন একটা কুয়াশার পর্দার মত থিরথির করে কাঁপছে। পথের দু'পাশে ইলেকট্রিক আলো গুলো ঝাপসা মনে হয়।

হীরা সিং ?

জী সাব্ !

গাড়ি চালাতে চালাতেই সাড়া দিল কিরীটীর ডাকে হীরা সিং।

আউটট্রাম ঘাট চল।

নিঃশব্দে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল হীরা সিং।

বুঝতে পারলাম প্রশ্ন না করেও, গতরাত্রে কিরীটী ফোনে যে রেঙ্গুনগামী জলযান জাহাজটির কথা বলেছিল লাহিড়ীকে এবং যেটা আজই প্রত্যূষে ছাড়বার কথা, সেই জাহাজেই আমরা চলেছি।

কিরীটী কিছু একটা মনে মনে স্থির করেছে।

একবার আড়চোখে অন্ধকারে কিরীটীর মুখের দিকে তাকালাম, কিন্তু বোঝবার উপায় ছিল না কিছু তার মুখের দিকে চেয়ে।

রাত প্রায় চারটে বাজে। হু-হু করে ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া চলমান গাড়ির জানালা-পথে আমাদের চোখেমুখে এসে ঝাপটা দিচ্ছে। ডানদিকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল—বাঁয়ে রেস কোর্স, দেখতে দেখতে মিলিয়ে যায় আমাদের চোখের সামনে।

গাড়ি একটু পরেই আউটট্রাম ঘাটের সামনে এসে দাঁড়াল। সকলে গাড়ি থেকে নামলাম। বিরাট জাহাজের মাস্তুলের লাল নীল বাতি চোখে পড়ে। জেটির মুখেই জলপুলিসের অফিসার মিঃ সুন্দরম্ দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিরীটী ও লাহিড়ীকে দেখে বললেন, গুড্ মর্নিং।

লাহিড়ী জিজ্ঞাসা করলেন, সব ঠিক আছে তো মিঃ সুন্দরম ?

হ্যাঁ।

ক্যাপ্টেন ?

তাঁকে আগেই সংবাদ দিয়েছি, তিনি জাহাজে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

চলুন তাহলে জাহাজে যাওয়া যাক।

সুন্দরমের কথা মিথ্যে নয়, ক্যাপ্টেন মিঃ বার্টন ডেকের উপরেই দাঁড়িয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

সাদা নেভি ড্রেস পরিহিত দীর্ঘকায় পুরুষ মিঃ বার্টন।

রাতের আকাশে শেষ অন্ধকারে আলোর ছোপ ধরেছে—বৃষ্টি তখনও ঝিরঝির করে পড়ছে।

লাহিড়ী জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ কেবিন?

চোদ্দ নম্বর কেবিন। মিঃ বার্টন জবাব দিলেন।

এমবারকেশন কখন শুরু হবার কথা? কিরীটী প্রশ্ন করে।

ভোর পাঁচটা থেকে। আর ঘণ্টা দেড়েক আছে বাকি।

চলুন তাহলে আমরা চোদ্দ নম্বর কেবিনেই যাই লাহিড়ী সাহেব।

চলুন। লাহিড়ী বলেন।

ক্যাপ্টেন বার্টনই আমাদের চোদ্দ নম্বর কেবিনের দিকে নিয়ে চললেন। সিঁড়ি দিয়ে আমরা দোতলায় উঠলাম। লাউঞ্জ ডেক পার হয়ে সরু প্যাসেজের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলাম।

শেষ প্রান্তের ডান দিকের কেবিনটাই চোদ্দ নম্বর কেবিন। কেবিনের দরজায় কার্ড ঝুলছে দেখলাম একটা।

মিঃ ও মিসেস থিব।

ক্যাপ্টেনের কাছেই কেবিনের চাবি ছিল। তারই সাহায্যে কেবিনের দরজা খুলে কেবিনের মধ্যে আমরা চারজন প্রবেশ করলাম।

আমি, কিরীটী, লাহিড়ী ও ক্যাপ্টেন।

আপনারা তো মিঃ লাহিড়ী এই কেবিনেই এখন থাকবেন? ক্যাপ্টেন প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ মিঃ বার্টন, আপনি যেতে পারেন এখন। তবে একটা কথা, আমরা না বলা পর্যন্ত কিন্তু জাহাজ ছাড়বেন না।

না, না, ছাড়ব না।

ঠিক আছে, তাহলে আপনি এখন যেতে পারেন।

ক্যাপ্টেন বার্টন কেবিন থেকে বের হয়ে গেলেন।

লাহিড়ী এবারে কিরীটীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, মিঃ রায়, এবারে অন্তত আপনার এই বিচিত্র অভিযানের রহস্যটা যদি খুলে বলেন—

বলছি, কিন্তু মিঃ জোসেফকে যে কলকাতায় পাঠিয়ে দেবার জন্য সিঙ্গাপুর পুলিসকে একটা ওয়ারলেস্ মেসেজ্ পাঠাতে বলেছিলাম, পাঠিয়েছেন তো?

হ্যাঁ, কাল রাত্রেই মেসেজ্ পাঠানো হয়ে গিয়েছে। এবারে কিছু আলোকসম্পাত করুন।

মিঃ জোসেফের যে মূল্যবান ও রেয়ার পার্লসগুলো খোয়া গিয়েছে তার মধ্যে সব চাইতে মূল্যবান ও পৃথিবীর অন্যতম রেয়ার যে মুক্তোটা তার নাম হচ্ছে ব্লু কুইন।

ব্লু কুইন!

হ্যাঁ। তার ওজন হবে প্রায় দেড়শ গ্রামের উপর। ঐ মুক্তোটি সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী আছে।

কি রকম?

খুব lucky ঐ মুক্তোটি—অর্থাৎ যার কাছে ঐ মুক্তোটি থাকবে ভাগ্য তাকে চারদিক থেকে ঐশ্বর্য এনে দেবে।

এ কাহিনী আপনি কোথায় শুনলেন?

ম্যাডাম মার্থিনের মুখেই শুনেছি। তিনিই আমাকে বলেছিলেন কথাটা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে।

তাই বুঝি!

হ্যাঁ। জোসেফ তার স্ত্রীকে তার বার্থ-ডেতে রেয়ার মুক্তোগুলো দিয়ে মালা করে দিয়েছিল, তার মধ্যস্থলে লকেটের মত ছিল ঐ

মুক্তোটি—ব্লু কুইন। মালা-চোর বিশেষ করে ঐ ব্লু কুইনের লোভেই মালাটি চুরি করেছিল।

কে সে?

রঘুনাথন।

তাহলে সেই রঘুনাথনই!

হ্যাঁ, তবে শেষ পর্যন্ত সেটি হজম করতে পারবে না;

কেন?

কারণ সে এখনও বুঝতে পারেনি যে তার প্রেমই তার গলায় ফাঁস হয়ে এঁটে বসতে চলেছে!

প্রেম?

হ্যাঁ।

তাহলে এর মধ্যে নারীও আছে?

আছে বৈকি। আর নারী একজন ছিল বলেই শেষ পর্যন্ত আমরা হয়ত মুক্তোগুলো উদ্ধার করতে পারব।

কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন, ঐ মুক্তোর মালার সঙ্গে ইউসুফ মিঞার হত্যার ব্যাপারটা জড়িয়ে আছে!

মিথ্যে আমি বলিনি লাহিড়ী সাহেব, ঠিকই বলেছি। কালো পাখীটাই ইউসুফের মৃত্যু-পরোয়ানা নিয়ে তার সামনে গিয়ে হাজির হয়েছিল।

কালো পাখী!

সেই ময়নাটার কথা ভুলে গেলেন?

না, ভুলিনি, কিন্তু সেই ময়নার সঙ্গে ইউসুফের মৃত্যুর কী সম্পর্ক তা তো বুঝতে পারছি না! লাহিড়ী বললেন।

মুক্তোর মালাটা রঘুনাথন চুরি করে মালা থেকে সম্ভবত মুক্তোগুলো খুলে ফেলে।

কেন?

কিরীটী বলে, তার কারণ মালার সব মুক্তোগুলোই সমান মূল্যের ছিল না। তার মধ্যে যে মুক্তোগুলোর দাম বেশি, সেগুলো ঐ ব্লু কুইনের সঙ্গে ময়নার খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে রঘুনাথন সম্ভবত ময়নাকে খাইয়ে দেয়।

বলেন কি!

আমার অনুমান তাই।

তারপর?

রঘুনাথন দলে-নিশ্চয়ই একা ছিল না—আর ঐ ধরনের চুরির ব্যাপারে সাধারণতঃ একাধিক লোকই থাকে। সেই কারণেই বিশেষ করে রঘুনাথনকে হয়ত ঐ বিশেষ পন্থাটা নিতে হয়েছিল, তার ভাগীদারের হাত থেকে কিছু দামী মুক্তো অন্তত সরিয়ে ফেলবার জন্য। তবে নিঃসন্দেহে যে পদ্ধতিটা সে মুক্তোগুলো সরিয়ে ফেলবার জন্য গ্রহণ করেছিল সেটা সত্যিই অভিনব তো বটেই, সেই সঙ্গে রঘুনাথনের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিরও পরিচয় তা থেকে আমরা পাই।

লাহিড়ী প্রশ্ন করেন ঐ সময়, কিন্তু ওই ভাবেই যে রঘুনাথন কিছু দামী মুক্তো সরিয়েছিল, আপনি অনুমান করলেন কি করে?

অনুমান করেছি দুটো ঘটনা থেকে।

কোন্ দুটো ঘটনা?

প্রথম ঘটনাটা হচ্ছে, মুক্তোর মালাটি অদৃশ্য হওয়াতে সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথন ও সেই অত্যাশ্চর্য ময়না পাখীটিরও অন্তর্ধান—

দ্বিতীয়?

দ্বিতীয় হচ্ছে, সেই পাখী কিনে ইউসুফ মিঞাকে মৃত্যুবরণ করতে হল বলে। ইউসুফের মৃত্যুর ব্যাপারটা ভেবে দেখুন—হত্যাকারী একাই একজন বা একাধিক থাকুক সে রাত্রে নিশ্চয়ই এসেছিল পাখীটি সরিয়ে নেবার জন্য। হয়তো ইউসুফ মিঞা জেগে উঠে বাধা দেয়—যার ফলে তাকে নৃশংসভাবে খুন হতে হয়!

কিন্তু আপনার অনুমানই যদি সত্য হয় মিঃ রায়—রঘুনাথন পাখীটা বেচবে কেন ?

রঘুনাথন বেচেছে কে বললে আপনাকে ? সুলতানের মুখে, পাখীটা যে বেচতে এসেছিল তার চেহারার যে বর্ণনা আমরা পেয়েছি, তার সঙ্গে রঘুনাথনের চেহারার মিল তো আমরা পাইনি !

তবে ? কে এসেছিল পাখী বেচতে ?

রঘুনাথন নয়—তৃতীয় কোন ব্যক্তি. যে পাখীর পেটে ঐ মুক্তো আছে নিশ্চয়ই জানত না।

তাই যদি হয় তো সে পাখীটা পেল কোথা থেকে ? রঘুনাথন কি পাখীটাকে সতর্ক প্রহরায় রাখেনি ?

নিশ্চয়ই রেখেছিল।

তবে ?

সে ব্যাপারটা জানতে হলে আমাদের ডি'সিলভাকে প্রয়োজন। কারণ ডি'সিলভার সঙ্গেই সে লোকটা ইউসুফ মিঞার কাছে পাখীটা বেচতে গিয়েছিল। কিন্তু আর না—চুপ ওরা বোধ হয় এসে গেছে—পায়ের শব্দ পাচ্ছি।

সত্যিই প্যাসেজে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল।

কুইক্, দরজার দুপাশে সব সরে দাঁড়ান। কিরীটী চাপা গলায় নির্দেশ দিল।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা দরজার দুপাশে—একদিকে কিরীটী ও অন্যদিকে আমি ও লাহিড়ী সরে দাঁড়ালাম।

একটু পরেই দরজা খুলে গেল কেবিনের।

প্রথমে একজন দামী স্যুট পরিহিত পুরুষ ও তার পশ্চাতে এক বর্মিনী নারী কেবিনের মধ্যে প্রবেশ করল। এবং তারা কিছু বোঝবার আগেই চকিতে কিরীটী ওদের সামনে এগিয়ে গিয়ে কঠোর কণ্ঠে নির্দেশ দিল, মিঃ থি'ব, কোন রকম পালাবার চেষ্টা করো না বা

গোলমাল করো না, পুলিস কমিশনার মিঃ লাহিড়ী তোমাকে অ্যারেস্ট করতে এসেছেন।

॥ আট ॥

আমি তখন বিস্ময়ে যেন একেবারে অভিভূত।

থি'ব নামধারী লোকটিকে না চিনলেও তার সঙ্গিনী নারীকে চিনতে পেরেছিলাম—ম্যাডাম মা'থিন।

'থি'বর নার্ভের কিন্তু সত্যিই প্রশংসা করতে হয়। নিঃশব্দে সে তখন কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার দেহের গঠন বেশ বলিষ্ঠ। তার চ্যাপ্টা মঙ্গোলিয়ান টাইপের হলদেটে মুখ দেখলে বুঝতে কষ্ট হয় না সে একজন বর্মীই।

পূর্ণ লাহিড়ী ইতিমধ্যে থি'বর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর হাতে পিস্তল। বলা বাহুল্য লাহিড়ীর অঙ্গে পুলিস অফিসারের ইউনিফর্মই ছিল।

অল্প দূরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে মা'থিন। সেও কিরীটীর মুখের দিকেই চেয়েছিল।

থি'বই প্রথমে কথা বললে, কিন্তু আমি তো এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না মশাই—এভাবে আমার বিনা অনুমতিতে আমার রিজার্ভড্ কেবিনে অনধিকার প্রবেশই বা করেছেন কেন আর আমাকে এভাবে ইনসাল্ট করবারই বা দুঃসাহস হল কি করে আপনাদের ?

কিরীটী পূর্ণ লাহিড়ীর দিকে তাকিয়ে বললে, মিঃ লাহিড়ী—arrest him !

তাই নাকি! ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে বলে ওঠে থি'ব, কিন্তু কেন জানতে পারি কি?

ব্লু কুইন ও অন্যান্য কিছু মূল্যবান মুক্তো সরানোর জন্য এবং টেরিটিবাজারের ইউসুফ মিঞাকে হত্যা করবার অপরাধে।

মশায়েরা কি গাঁজায় দম দিয়ে এসেছেন! আবার ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে বলে ওঠে থি'ব।

মিসেস জোসেফ, কিরীটী এবারে অদূরে দণ্ডায়মান নির্বাক মা'থিনের দিকে তাকিয়ে বললে, আপনার বুদ্ধির তারিফ করি ম্যাডাম—কিন্তু তাহলেও বলব—

কিরীটীর কথাটা শেষ হল না। আমাদের সকলেরই দৃষ্টি তখন মা'থিনের উপর গিয়ে পড়েছিল মুহূর্তের জন্য, আর সেই মুহূর্তটুকুরই সুযোগে অঘটনটা ঘটে গেল।

একটা তীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকার করে টলে পড়ল মা'থিন। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বাঘের মত ঐ বয়সেও কিরীটী থি'বর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে যুযুৎসুর প্যাঁচে ধরাশায়ী করে।

শীগগিরি হাতকড়া লাগান মিঃ লাহিড়ী! কিরীটী চেঁচিয়ে ওঠে।

পূর্ণ লাহিড়ী মুহূর্ত দেরি করেন না—পকেট থেকে হাতকড়াটা বের করে থি'বর হাতে পরিয়ে দেন।

হিংস্র দুটো চোখের দৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল, থি'ব যেন কিরীটীকে সুযোগ পেলে মূহূর্তে শেষ করে দেবে।

কিরীটী থি'বর হাতে হাতকড়া পরানো হতেই, এগিয়ে যায় ভূপতিত মা'থিনের দিকে।

রক্তে তার সমস্ত জামা লাল হয়ে উঠেছে।

একটা ছোট ছোরা তার বামদিককার বক্ষে সমূলে বিদ্ধ।

থেকে থেকে মা'থিনের সমস্ত দেহটা আক্ষেপ করছে।

হঠাৎ ঐ সময় কেবিনের দরজাটা খুলে গেল, জাহাজের একজন খালাসী একটা খাঁচা হাতে কেবিনের মধ্যে এসে ঢুকল—তার পশ্চাতে ক্যাপ্টেন।

ক্যাপ্টেন কেবিনের মধ্যে পা দিয়েই বলে ওঠেন, Good God! এ কি?

ক্যাপ্টেন, শীগগির আপনার জাহাজের ডাক্তারকে ডাকুন—বাঁচবে না বুঝতে পারছি, তবু let us try!

ক্যাপ্টেন ছুটে কেবিন থেকে বের হয়ে গেলেন।

মা'থিন, মা'থিন!

চমকে আমরা ফিরে তাকালাম।

খাঁচার মধ্যে ময়না পাখাটা বলছে, মা'থিন, মা'থিন!

খালাসীটা তখনও হতভম্ব হয়ে খাঁচাটা হাতে ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মিনিট দশেকের মধ্যেই জাহাজের ডাক্তার এল। কিন্তু বাঁচানো গেল না মা'থিনকে।

সে মারা গেল।

শুধু মৃত্যুর আগে একটা কথা সে কোনমতে টেনে টেনে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে গেল, কিরীটী যেন মুক্তেগুলো পেলে তার স্বামী জেসেফকে পাঠিয়ে দেয়। সে পারল না মুক্তোগুলো উদ্ধার করতে।

স্ট্রেচারে করে ঢাকা দিয়ে মা'থিনের মৃতদেহটা জাহাজ থেকে নামিয়ে আনা হল এবং থি'বকে হাতকড়া পরা অবস্থায় পুলিস-ভ্যানে সশস্ত্র প্রহরীর জিম্মায় তুলে দেওয়া হল।

ঐ দিনই দ্বিপ্রহরে।

গরাদের মধ্যে হাতকড়া অবস্থায় থি'ব।

কিরীটী নানাভাবে তাকে প্রশ্ন করল, কিন্তু থি'ব একেবারে যেন বোবা!

তার মুখ থেকে একটি কথাও বের করা গেল না। এবং মুক্তো-গুলো যে কোথায় আছে তারও কোন সন্ধান করা গেল না।

অবশেষে কিরীটী বললে, ও মুখ খুলবে না মিঃ লাহিড়ী। ডি'সিলভার সন্ধান যতদিন না পাওয়া যায় আমাদের অপেক্ষাই করতে হবে। আপনি সমস্ত জাহাজে জাহাজে ওয়ারলেস মেসেজ্ পাঠিয়েছেন তো?

হ্যাঁ, আশা করছি দু-চারদিনের মধ্যেই ডি'সিলভার সন্ধান পাব।

ঠিক আছে চলুন, আপনার অফিস-ঘরে যাওয়া যাক। কিরীটী বললে।

সকলে আমরা লাহিড়ীর অফিস-ঘরে এসে ঢুকলাম।

চেয়ারে বসে একটা চুরোটে অগ্নিসংযোগ করতে করতে কিরীটী বললে, পাখীটা কোথায়?

আমার কোয়ার্টারেই আছে। কিন্তু পাখীটা যেন ক্রমশঃ কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ছে মিঃ রায়—কিছু খাচ্ছেও না।

স্বাভাবিক। মুক্তোগুলো হজম করতে পারবে কেন? বেচারী! ইচ্ছা ছিল অমন একটা rare specimen যদি বাঁচানো যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনে হচ্ছে তা আর সম্ভব হবে না। ও না মরলে আমাদেরই ওকে মারতে হবে—মুক্তোগুলো ওর পেট থেকে উদ্ধার করবার জন্য।

কিন্তু থি'ব যদি জানতই পাখীটার পেটেই মুক্তোগুলো আছে, পাখীটাকে মারেনি কেন? লাহিড়ী প্রশ্ন করে।

অমন একটা আশ্চর্য পাখী—ওর দামও তো কম নয়—তাই

ভেবেছিল হয়ত পাখীটার পায়খানার সঙ্গে যদি মুক্তোগুলোও পাওয়া যায় পাখীটাও মারতে হয় না।

পরের দিনই পাখিটা মারা গেল।

পাখীটার পেট চিরে ফেলা হল—বারোটা বড় আকারের মুক্তো ও ব্লু কুইন পাখীটার পেটের মধ্যেই পাওয়া গেল।

নাড়ির মধ্যে ঘা হয়ে গিয়েছিল।

সেই ঘা-ই পাখীটার মৃত্যুর কারণ হয়েছিল।

লাহিড়ী বলেন, চমৎকার পন্থা নিয়েছিল দেখছি লোকটা মুক্তোগুলো সরাবার অন্যের দৃষ্টি থেকে।

নিঃসন্দেহে। আর তারও হয়ত পাখীটার উপরে লোভ ছিল বলে শেষ পর্যন্ত পাখীটা মারতে পারেনি।

॥ নয় ॥

তিনদিন পরেই তার পাওয়া গেল, জোসেফ কলকাতায় আসছে সিঙ্গাপুর থেকে দিন দুয়েকের মধ্যেই এবং ওই দিনই ডিসিলভার সন্ধান পাওয়া গেল।

অস্ট্রেলিয়ার বন্দরে এম. এস. বাটোরি জাহাজে সে ছিল। অস্ট্রেলিয়া সরকার তার কলকাতায় আসার ব্যবস্থা করেছিলেন।

পরের দিন ডিসিলভাও এসে পৌঁছাল।

ডিসিলভাকে রঘুনাথনের ফটো দেখানো হল, কিন্তু ফটো দেখে সে বললে, যে তার সঙ্গে গিয়ে ইউসুফ মিঞাকে ময়নাটা বিক্রি করেছিল সে ওই লোক নয়।

কিরীটী প্রশ্ন করল, তবে সে লোকটা কোথায়?

সে তো হুজুর কলকাতাতেই থাকে।

কলকাতায় থাকে ?

আজ্ঞে।

কোথায় থাকে কলকাতায় জান ?

খিদিরপুরের এক বস্তীতে। তার নাম রতিলাল—জাহাজের মাল খালাস করে।

তারপর কিরীটীর প্রশ্নের উত্তরে যা বললে ডি'সিলভা, রতিলালকে ডি'সিলভা অনেক দিন আগে থাকতেই চেনে—তার বস্তীর বাসায় সেবার গিয়ে তার ঘরে ওই ময়নাটা সে দেখতে পায়। রতিলাল বলে, জাহাজের মাল খালাস করতে করতে খাঁচাসমেত ঐ পাখীটা সে দেখতে পায়। পাখীটা 'রবিন' 'রবিন' বলে ডাকছিল।

পাখীটা দেখেই চিনতে পারে ডি'সিলভা পাখীটা মূল্যবান। সে-ই তখন রতিলালকে বলে পাখীটা বেচলে সে অনেক টাকা পাবে। আর সে যদি চায় তো ডি'সিলভা পাখীটা বিক্রী করে দিতে পারে।

রতিলাল সম্মত হয়—তখন ডি'সিলভা তাকে নিয়ে ইউসুফের কাছে যায়।

ইউসুফ পাখীটার দাম পাঁচশো টাকা দিতে চায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাজার টাকায় পাখীটা ইউসুফ কিনে নেয়।

তারপর ?

তারপর আর আমি কিছু জানি না হুজুর, তবে রতিলাল আমাকে পাখীটা হাজার টাকায় বিক্রি করে দেওয়ার জন্য একশো টাকা দিয়েছিল।

কিরীটী অতঃপর মিঃ লাহিড়ীর দিকে তাকিয়ে বললে, চলুন একবার রতিলালের ওখানে যাওয়া যাক এখুনি।

তখুনি ওরা জীপে করে রওনা হল রতিলালের সন্ধানে।

রতিলাল তার ডেরায় ছিল।

সুলতান যেমন বর্ণনা দিয়েছিল, রতিলালকে দেখতে ঠিক তেমনই। তার জন্ম জানা গেল পেগুতে।

তার মা ছিল বর্মী এবং বাপ ছিল এক পাঞ্জাবী।

মৌচির মাইনে সে কাজ করত। চুরির ব্যাপারে তার চাকরি যায়। তারপর সে জাহাজের খালাসী হয়ে কলকাতায় চলে আসে।

তার কাছে আরও একটা কথা জানা গেল।

যেদিন সে ইউসুফকে ময়নাটা বিক্রি করে আসে, সেইদিনই সন্ধ্যার দিকে এক সাহেব খোঁজ করতে করতে তার ডেরায় আসে—পাখীটার সন্ধানে।

তারপর?

আমি বলে দিলাম, পাখীটা ইউসুফ মিঞাকে বিক্রী করেছি। শুনে সে চলে গেল।

কিরীটীর পরামর্শে রতিলালকে লালবাজারে নিয়ে আসা হল।

থি'বর ফটো তাকে দেখানো হল।

ফটোটা দেখেই রতিলাল বললে, ওই লোকটাই পাখীর সন্ধানে তার কাছে গিয়েছিল।

একজন সার্জেন্ট এসে ঘর ঢুকে স্যালুট দিল মিঃ লাহিড়ীকে।

স্যার!

ইয়েস।

মিঃ জোসেফ বলে এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

নিয়ে এস এই ঘরে।

জোসেফ এসে ঘরে ঢুকল।

বয়েস হয়েছে লোকটার। মাথার চুল প্রায় অধেক পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে।

মিঃ লাহিড়ী?

আমিই লাহিড়ী! বসুন।

আমার মুক্তোগুলো পাওয়া গিয়েছে?

পেয়েছি, বারোটা।

ব্লু কুইন?

সেটাও পাওয়া গিয়েছে।

আঃ, আপনি আমাকে নিশ্চিন্ত করলেন।

কিন্তু আর মুক্তোগুলোর কোন সন্ধান এখনও করতে পারিনি।

না পেলেও ক্ষতি নেই—ব্লু কুইন পাওয়া গিয়েছে তাতেই আমি খুশি। ভাল কথা, আমার স্ত্রী কোথায় জানেন? গ্র্যাণ্ডে খোঁজ করেছিলাম কিন্তু তাঁরা বললেন কয়েকদিন আগেই নাকি সে হোটেল ছেড়ে চলে গিয়েছে।

মিঃ জোসেফ?

দেখুন তো এই ফটোটা—এই লোকটাকে আপনি চেনেন?

থি'বর ফটোটা এগিয়ে দিল কিরীটী জোফেসের সামনে।

এ কি! এ ফটো আপনি কোথায় পেলেন? জোসেফ বলে ওঠে।

চেনেন ফটোর লোকটিকে?

নিশ্চয়ই চিনি—এ তো থি'ব!

কতদিন পরিচয় আপনার সঙ্গে থি'বর?

তা বছর দুয়েক তো হবেই—সিঙ্গাপুরেই ও থাকে—আমার বাড়িতে কতদিন এসেছে।

আপনার স্ত্রীর সঙ্গেও ওর আলাপ ছিল?

ছিল বৈকি। অনেক দিনের আলাপ ওদের—রেঙ্গুন থেকেই।

লোকটা কি করত সিঙ্গাপুরে?

ওরও জুয়েলারীর ব্যবসা ছিল ; কিন্তু ওর সম্পর্কে এত কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন ?

কারণ আমাদের ধারণা—

কী ?

ওরই পরামর্শে রঘুনাথন, আপনার ভৃত্য, মুক্তোর হারটা চুরি করেছিল।

সর্বনাশ ! কি বলছেন আপনি ?

তাই।

রঘুনাথনও ধরা পড়েছে নিশ্চয়ই !

না। যতদূর মনে হচ্ছে সে হয়ত আর বেঁচে নেই।

বেঁচে নেই ?

না। থি'বই সম্ভবত—হয়তো তাকে হত্যা করেছে।

বলেন কি !

আরও একটা দুঃখের সংবাদ আছে, মিঃ জোসেফ—

দুঃখের সংবাদ ?

হ্যাঁ, আপনার স্ত্রী বেঁচে নেই।

মা'থিন নেই ?

অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে ওঠে জোসেফ।

না, তাকে ঐ থি'বই হত্যা করেছে।

সংক্ষেপে মিঃ লাহিড়ীই তখন সেদিনকার জাহাজের কেবিনের ঘটনাটা বিবৃত করেন।

জোসেফ সব শুনে যেন স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

তার দু চোখের কোলে জল টলমল করতে থাকে।

ব্যাপারটা মোটামুটি অতঃপর সব বোঝা গেলেও, থি'ব কিন্তু

কিছুই স্বীকার করল না। সে যেমন চুপ করে ছিল তেমনিই চুপ করে রইল।

জোসেফ মুক্তোগুলো আইডেনটিফাই করার পর মুক্তোগুলে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হল।

সেদিন সন্ধ্যায় কিরীটীর গৃহে তার বাইরের ঘরে বসে ওই মুক্তো চুরির কাহিনীই কিরীটী বলছিল।

মিঃ লাহিড়ী প্রশ্ন করেন, কিন্তু আপনি জেনেছিলে কি করে যে পরের দিন জাহাজেই মা'থিন ও থি'ব যাবে রেঙ্গুনে?

কিরীটী বললে, সে রাত্রে মা'থিনের অ্যালবাম ঘাঁটতে ঘাঁটতে তার মধ্যেই আমি টিকিট দেখতে পাই জাহাজের। একটা খামে মধ্যে টিকিটটা ছিল—খামের উপরে লেখা ছিল, মিসেস থি'ব—অ জাহাজের ডিপারচারের তারিখ ও সময় লেখা ছিল। তারপ মা'থিনের মুখে সব কথা শুনে আমার ধারণা হয় মা'থিনই মিসেস থি' পরিচয়ে রেঙ্গুনে পালাচ্ছে। কিন্তু একটা ব্যাপারে মনের মধ্যে আমার খটকা ছিল তখনও।

কী?

মা'থিনও কি তবে ঐ চুরির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট? থি'ব নামটা কোন বর্মীর—মনে হয়েছিল বুড়ো জোসেফকে ছেড়ে হয়ত মা'থিন থি'বর সঙ্গে পালাচ্ছে। কিন্তু পরে মা'থিনের চোখে জল দেখে বুঝতে পেরেছিলাম ধারণাটা আমার ভুল। মা'থিন সত্যিসত্যিই তার স্বামীকে ভালবাসত—আর তার জন্যই সে মুক্তোগুলো উদ্ধারের জন্য দৃঢ়পতিজ্ঞ।

তারপর?

তারপরও আমার ধারণা যে মিথ্যা নয়, সেটা তো প্রমাণই হয়ে গেল যখন থি'ব মা'থিনকে হত্যা করল আমাদের চোখের সামনে